শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শিশির পাবলিশিং হাউস

২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৬।

মূল্য ৩।০ টাকা।

সূচী

———

উপহার

আমার কথা :

খুব ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় এবং তাঁর স্নেহসৌভাগ্য-লাভে ধন্য হয়েছিলুম। তখন দেশের কাছে ঠাকুরবাড়ার ছেলে....অনেক টাকাকড়ি আছে....বসে বসে কবিতা লেখেন—এই ছিল তাঁর পরিচয়। তাঁর কবিতা পড়েই সাহিত্য-সাধনায় মনে জেগেছিল আগ্রহ এবং কবিতা লেখা সুরু করেছিলুম। পরে কিশোর বয়সে সাহিত্য-সাধনায় তাঁর কাছে রচনার সম্বন্ধে কত উপদেশ, কত পরামর্শ পেয়েছি।

আইন-ক্লাশে লেকচার এ্যাটেণ্ড করলেও আইনের পরীক্ষা দিয়ে ওকালতির বাসনা ছিল না—সাহিত্যকেই করবো জীবনের একমাত্র ব্রত....এই ছিল ইচ্ছা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রার আসরে আমাকে বুঝিয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন—সাহিত্যকে পেশা করো না....নেশা করো। তাঁর সে কথা মেনে ১৯১১ সালে আইন পরীক্ষা পাশ করে কোর্টে বেরিয়েছিলুম ওকালতি-পেশা নিয়ে।

কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ রেখেছি অটুট....আজীবন : এবং রবীন্দ্রনাথের কর্ম্ম-আর-চিন্তাধারার সঙ্গে সংযোগ কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। সে-কর্ম্ম আর চিন্তাধারা আমি যেমন উপলব্ধি করেছি, সেই উপলব্ধিটুকু—তার সঙ্গে তাঁর প্রথম-জীবনের বহু কাহিনী....এ যুগের অনেকে যে সব কাহিনী জানেন না—এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি। ইতি—

৫২এ, বেণীনন্দন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, পৌষ, ১৩৬৪

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পূজনীয়া

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

শ্রীচরণেষু
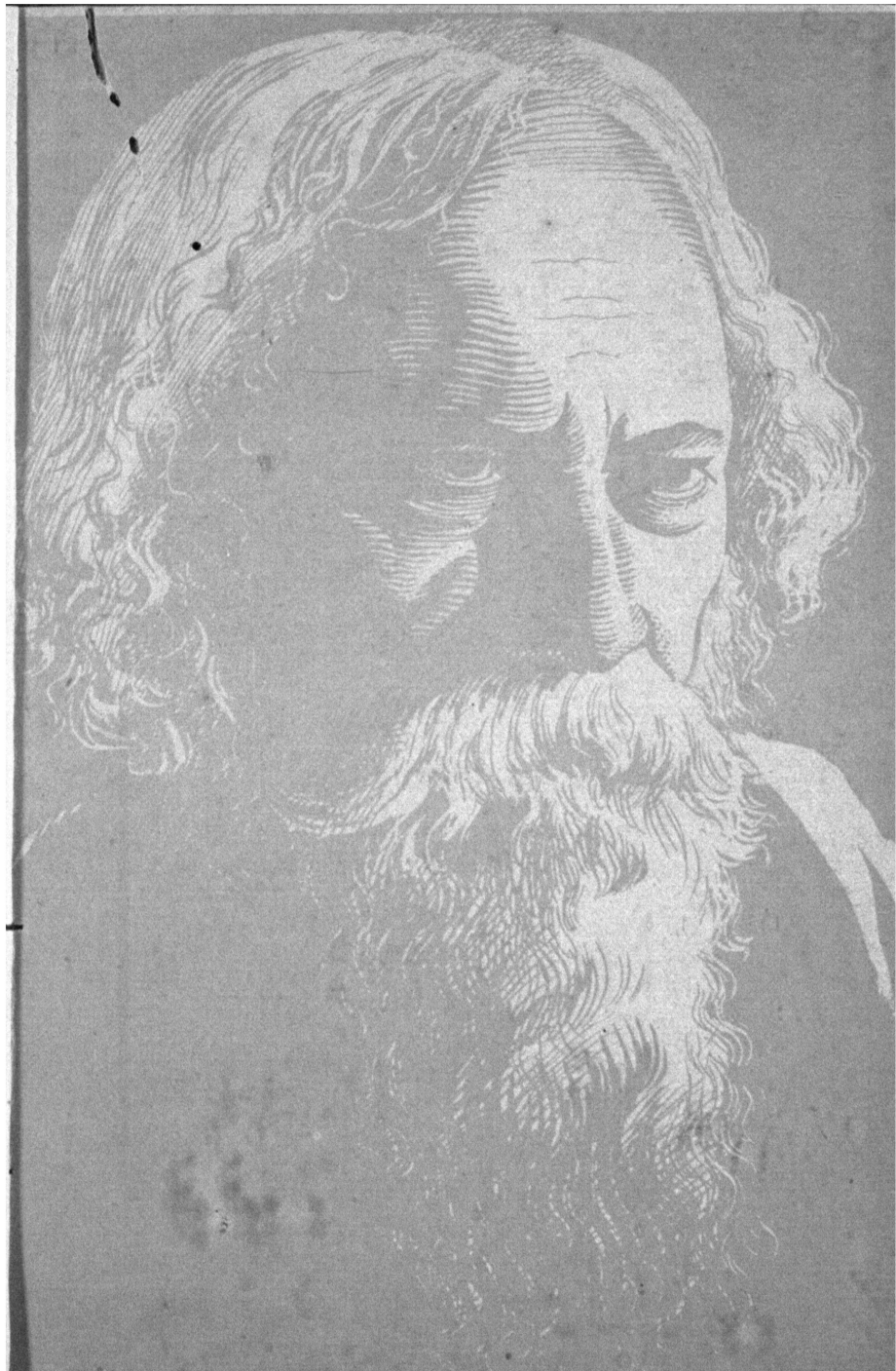
রবীন্দ্র-স্মৃতি

এক

উদয়-রবির কিরণে

বাঙলা ১৩২০সাল···ইংরাজী ১৯১৩।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি রয়টারের টেলিগ্রামে খবর এলো ভারতবর্ষে—

(Reuter's Services)

London, Nov. 13, 1913.

The Nobel Prize for literature has been conferred on the Indian Poet Rabindra Nath Tagore.

এ-সংবাদ যত খবরের কাগজে ছেপে বেরুলো ১৪ নভেম্বর সকালে। এ-সংবাদে সারা ভারতবর্ষ জয়োল্লাসে দুলে উঠেছিল। আমাদের তখন বয়স তরুণ···আমরা তখনি বোলপুরে রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখে আমাদের গৌরব-আনন্দ নিবেদন করলুম। বাঙলা দেশে তার আগে ১৩১৬ সালে টাউন হলে বাঙালীরা মিলে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা-সভায় তাঁকে

শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেও বাঙলা দেশে একদল সাহিত্যিকের দারুণ বিদ্বেষ ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনার উপর। তাঁদের মধ্যে অনেকের মুখ কালো হয়েছিল এ-সংবাদে, জানি এবং তাঁরা বিদ্রূপ করে এমন কথাও প্রচার করেছিলেন—জোগাড়! টাকার মানুষ রবীন্দ্রনাথ···বিলেতে গিয়েছিলেন···সেখানে মুরুব্বি পাকড়ে ব্যবস্থা করে এসেছেন!

তাঁদের এ-বিদ্রূপ ব্যর্থ করে, তাঁদের মুখ আরো কালো করে বাঙলার যত সুধী স্থির করলেন—৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে সকলে সদলে বোলপুরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রীতি-অভিনন্দন জানাবেন।

এই ব্যবস্থামতো ৭ই অগ্রহায়ণ বোলপুর একেবারে লোকে লোকারণ্য! বাঙলা দেশ তখন খণ্ডিত নয়···অখণ্ড বৃহত্তর বাঙলা দেশ—শুধু কলকাতা থেকে নয়, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পাটনা, এলাহাবাদ; পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি জায়গা থেকেও সুধীরা সদলে সমবেত হয়েছিলেন বোলপুরে। আমরা বোলপুরে গিয়েছিলুম ৬ অগ্রহায়ণ।

৭ তারিখে বোলপুর অপরূপ সাজে সজ্জিত···অগ্রহায়ণের হিমে যেন ফাল্গুনের মাধুরী বিকশিত হয়েছিল। লোকজন ব্যস্ত···ছাত্রছাত্রীরা, শান্তিনিকেতনের কর্ম্মীরা ষ্টেশনে এসে অতিথিদের বহু সমাদরে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গেলেন।

আসরে যথাসময়ে গান, অভিনন্দন, প্রীতি-অর্ঘ্য, অভিভাষণের ঘটা। এ-আসরে রবীন্দ্রনাথের সেই গান··· যে গানে বেদনা-অভিমানের রেশ আজো কানে বাজছে! রবীন্দ্রনাথের সে গান—

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে
পরতে গেলে লাগে,
ছিঁড়তে গেলে বাজে!
কণ্ঠ যে রোধ করে! সুর নাহি যে সরে
তোমার কাছে দেখাইনে মুখ মণিমালার লাজে!

তারপর প্রীতি-অভিনন্দনের, মাল্য-চন্দন-ভূষার পর্ব্ব চুকলে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

কবি-বিশেষের কাব্যে কেউ-বা আনন্দ পান···কেউ-বা উদাসীন থাকেন···কারো বা তাতে আঘাত লাগে এবং তাঁরা আঘাত দেন। আমার কাব্য সম্বন্ধেও এই স্বভাবের নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। এ-কথা আমার এবং আপনাদের জানা আছে। দেশের লোকের হাত থেকে যে অপযশ আর অপমান আমার ভাগে পৌঁচেছে, তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এতকাল আমি তা নিঃশব্দে বহন করে এসেছি। এমন সময়ে কি জন্য যে বিদেশ হতে আমি সম্মান লাভ করলুম তা এখনো পর্য্যন্ত আমি নিজেই ভালো করে উপলব্ধি করতে পারি নি। আমি সমুদ্রের পূর্ব্ব তীরে বসে যাঁকে

পূজার অঞ্জলি দিয়েছিলেম···তিনিই সমুদ্রের পশ্চিম তীরে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্য হাত প্রসারিত করেছিলেন—সে-কথা আমি জানতুম না। তাঁর প্রসাদ আমি লাভ করেছি···এই আমার পরম সত্য। * * * অতএব আজ যখন সমগ্র দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে আপনারা আমাকে সম্মান উপহার দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন···তখন সে-সম্মান কেমন করে আমি নির্লজ্জভাবে গ্রহণ করবো? * * * তাই আমি আপনাদের কাছে করজোড়ে জানাচ্ছি—যা সত্য, তা কঠিন হলেও আমি মাথায় করে নেবো···কিন্তু যা সাময়িক উত্তেজনার মতো, তা আমি স্বীকার করে নিতে অক্ষম!

রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা জানতেন, যাঁরা মানতেন···তাঁরা বুঝেছিলেন তাঁর এ-কথায় অভিমানের বেদনা! যাঁরা এতকাল তাঁকে বিদ্বেষ করেছেন···তাঁরা রাগ করে মনে মনে গর্জ্জন তুলেছিলেন—বাড়ী বয়ে এলুম···বাড়ীতে পেয়ে এমন অপমান!

রবীন্দ্রনাথের এ-অভিমানের পরিমাণ একালের অনেকে হয়তো ঠিক বুঝবেন না···কিন্তু আমরা বুঝেছিলুম···তার কারণ, ছোট বয়স থেকেই আমরা তাঁকে যেভাবে পেয়েছিলুম······

মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের সব কথা···তাঁর নোবেল প্রাইজ পাবার আগেকার দিনের কথা এবং তার পরের কথাও।

উদয়-রবির কিরণে

তাঁকে আমরা জেনেছিলুম···মনের অতি-আপনজন বলে এবং তেমনি ভাবেই তাঁকে পেয়েছিলুম। জীবনে সে-সব দিনের স্মৃতি সোনার রেখায় জলজল করছে!

১৮৯৬ সাল···বয়স তখন বারো বছর। সে-যুগে স্কুলের বই ছাড়া বাহিরের কোনো বই পড়া ছিল নিষিদ্ধ। পড়ছি, ধরা পড়লে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল; তার উপর ছেলেদের পড়ার যোগ্য বাংলা বইয়েরও ছিল অপ্রতুল। ছোটদের মাসিকপত্র ছিল সখা, সখা-সাথী, মুকুল···এই তিনখানি। এই তিনখানি পড়ে মনের ক্ষুধা মেটাতুম; এবং এই সময়েই যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় ছোটদের দুঃখ বুঝে ছোটদের উপর দরদ-মমতাবশে একে একে বার করছিলেন তাঁর হাসি ও খেলা, ছবি ও গল্প প্রভৃতি অপূর্ব্ব বইগুলি। তাঁর সে বইয়ে যখন পড়েছিলুম রবীন্দ্রনাথের কবিতা···বিষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর···রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

দিনের আলো নিবে এলো সুয্যি ডোবে ডোবে
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ
মন্দিরেতে কাঁশর ঘণ্টা বাজলো ঠং ঠং!
ও পারেতে বিষ্টি এলো ঝাপসা গাছপালা
এ পারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।

বৃষ্টি-আসার কথা খুব ছোট বয়স থেকে মা-দিদিমা ছড়ার মতন সুর করে বলতেন…তা থেকেই শিখেছিলুম। সে-ছড়া ছিল—

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এলো বাণ
শিব-ঠাকুরের বিয়ে হচ্ছে, তিন কন্যা দান।
এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন, আর কন্যা খান…ইত্যাদি

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যখন পড়লুম ঐ কটি ছত্র… বালক-চিত্তে জেগে উঠলো সন্ধ্যায় মেঘ-করে বৃষ্টি-আসার দৃশ্য! মন্দিরে বাজছে কাঁশর-ঘণ্টা…সুষিা ডোবে ডোবে… সে-সময়ে আকাশে মেঘ…রঙের উপর রঙ… ও-পারের আকাশে লক্ষ মাণিক জ্বালা। কবি বললেন এ-দৃশ্য দেখে—

বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এলো বাণ।

তারপর শেষের ক'ছত্র—

কবে বিষ্টি এসেছিল, বাণ এসেছিল কোথা—
শিব-ঠাকুরের বিযে হলো, কবেকার সে কথা।
সে দিনও কি এমনিতর মেঘের ঘটাখানা?
থেকে থেকে বিজুলী কি দিতেছিল হানা?

এ-সব ছত্র পড়ে মনে শুধু সন্ধ্যায় বৃষ্টি আসার দৃশ্যই ভেসে ওঠে নি…মনের কপাট খুলে কল্পনার কুঞ্জ জেগেছিল! এমন কবিতা কে লিখেছে—এই কথা শুধু মনে হয়েছিল।

উদয়-রবির কিরণে

শুধু কি এই কবিতা! মুকুলে বেরিয়েছিল—

কোশল নৃপতির তুলনা নাই

জগৎ জুড়ি যশোগাথা—

ক্ষীণের তিনি সদা শরণ ঠাঁই

দীনের তিনি পিতা-মাতা।

যেমন চমৎকার গল্পটি···তেমনি দরদ দিয়ে লেখা! পাঠ্যগ্রন্থে কবিতায়-লেখা এমন কত গল্প তো পড়ি···কিন্তু এমন করে কেউ গল্প বলতে পারেন নি।

তখন বিস্ময় আনন্দ আর শ্রদ্ধা সীমাহীন হয়ে উঠেছিল! এমন ভালো কবিতা ··এমন বিচিত্র ছন্দ—কৈ, আর কোনো কবির কবিতায় (তখনকার দিনে) পড়ি না তো! রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লুম—

কার পানে মা চেয়ে আছো

মেলি দুটি করুণ আঁখি···

কে ছিঁড়েছে ফুলের পাতা

কে ধরেছে বনের পাখি?

যে-সব কবিতা তখন পড়তুম···সব কবিতায় শুধু তত্ত্ব-কথা, আর গুরুগম্ভীর উপদেশ। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এমন ঘরোয়া কথা···মনে যে-কথা ছোট বয়সে নিত্য জেগে ওঠে···এমন কথা কবিতায় প্রথম পেলুম রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। তাঁর পায়ে মন শুধু লুটিয়ে ক্ষান্ত রইলো না···এমনি কবিতা যদি লিখতে

পারি, এ-আলোয় যদি নিজের মনের কোণে ছোট একটি দীপ.. জ্বালতে পারি—এ-বাসনায় মন আকুল হয়েছিল!

মনের এ-আকুলতায় কোনোমতে ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লেখবার চেষ্টাও চলেছিল···আমার সেই বারো বছর বয়সে! লিখতুম কবিতা—যা মনে আসতো···লিখতুম। একটি কবিতার কটি ছত্র আজো মনে আছে। লিখেছিলুম—

হে ঈশ্বর অব্যক্ত অচিন্ত্য—
ধরণী না রহিলে কে তোমাকে চিনতো!
আকাশে রবি-শশী, তারকা রাশি রাশি—
কুসুমে এত রঙ, গন্ধ চলে ভাসি!
ভোরের পাখী গায়, নদীর কলতান···
মা বাপ ভাই বোন—এসব তব দান!
না-চেয়ে পেয়ে এত, জীবন মধুময়!
করুণা-স্নেহ কত! তোমার গাহি জয়!

এমনিভাবে চলেছিল আমার কাব্য-সাধনা! তারপর জীবনে এক স্মরণীয় দিনের উদয়! এই সময়ে একদিন আমার মাতৃদেবী এবং ছোটদিদি (আমার মাসতুতো ভগ্নী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী)···এশকর্ট করে আমি এঁদের নিয়ে যাই স্বর্ণকুমারী দেবীর গৃহে। তিনি তখন থাকেন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের ফটকওয়ালা প্রকাণ্ড কমপাউণ্ডঘেরা বাড়ীতে। ও-মহল্লার নাম কাশিয়া বাগান।

তাঁর দুই কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী আর সরলা দেবী তখন ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা। সেখানে স্বর্ণকুমারী দেবীর কাছে আমার পরিচয়-প্রসঙ্গে ছোটদিদি বলেছিলেন—ও কবিতা লেখে। শুনে স্বর্ণকুমারী দেবী বলেছিলেন—বটে! রবি এখানে মাঝে মাঝে আসেন। যেসব ছেলেমেয়ে কবিতা লেখে, তাদের উপর রবির ভারী মায়া! এবারে রবি এলে ওকে নিয়ে আসবো···রবির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।

এ-কথায় মনে যে ভাব হয়েছিল···বলবার নয়। রবি··· মানে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর···যিনি অমন চমৎকার কবিতা লেখেন!

স্বর্ণকুমারী দেবী এ-কথা রক্ষা করেছিলেন। এ-ঘটনার দিন দশ-বারো পরেই একদিন মায়ের নামে স্বর্ণকুমারী দেবীর চিঠি নিয়ে কাশিয়াবাগান থেকে এলো তাঁর গাড়ী। চিঠিতে লেখা—রবি এসেছে···সৌরীনকে পাঠিয়ে দেবেন। গাড়ী পাঠালুম···এই গাড়ীতে। আমি চললুম সেই গাড়ী করে— রবীন্দ্র-দর্শনে।

দেখা হলো। আমার কবিতার খাতাখানি সঙ্গে নিতে ভুলিনি। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন আমার লেখা কবিতা। দশ-বারোটি কবিতা লিখেছিলুম। বললুম—কি লিখবো··· ভেবে পাই না। সকলে লেখেন···আকাশ, নক্ষত্র, সূর্য্য, চন্দ্র, নদী—এই সব নিয়ে; সে-সব নিয়ে লিখতে গেলে তাঁদের লেখা ভাব ভাষা ছাড়া আর কিছু পাই না।

হেসে রবীন্দ্রনাথ বললেন—স্কুলে ইংরেজী কবিতা পড়ো তো···সংস্কৃত শ্লোক পড়ো···সেই সব কবিতা আর শ্লোক বাঙলায় অনুবাদ করো···গদ্যে নয়, পদ্যে। এমনি করে লিখতে লিখতে ছন্দে হাত পাকবে। তারপর যা কিছু দেখবে ···লেখবার চেষ্টা করো। যেমন দেখবে···দেখে যেমন মনে হবে···তাই লিখবে। দেখা-জানা বা ভাবার উপর বেশী কিছু বিদ্যা ফলাবার চেষ্টা নয়। আর বলেছিলেন—চেষ্টা ছেড়ো না···হাতের লেখা (hand-writing) অনেক লিখতে লিখতে তবে হাতের লেখা পাকে, হাতের লেখা ভালো হয়···কবিতা বলো, গল্প বলো···লিখতে লিখতে তবে লেখা শিখবে···লেখা পাকবে!

এ-অমূল্য উপদেশ শিরোধার্য্য করে লেখা চললো আমার। শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় মন ভরে উঠেছিল। আমার এ লেখা লেখার আগে কারো কাছে উৎসাহ পাইনি। অনেককে লেখা পড়িয়েছিলুম—কেউ বলেছেন, এখন লেখাপড়া করো···এ সবে কিছু হবে না। শ্রদ্ধা হলো···তার কারণ, অত বড় কবি··· যিনি অমন লিখতে পারেন···আমার মতো এক স্কুলের ছাত্রকে তিনি তুচ্ছ না করে সস্নেহে এত কথা বললেন···এত উৎসাহ দিলেন! মনে পড়েছিল একলব্যের কথা—দ্রোণাচার্য্যকে মনে-মনে গুরু বলে মেনে একলব্য শস্ত্র-চর্চ্চা করেছিলেন··· আমিও মনে মনে রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে মেনে কাব্য-চর্চ্চায়

মনোনিবেশ করবো—এ-কথা কেউ জানবে না, কাকেও বলবো না!

এবং তার পরের বছর থেকে আমাদের স্কুলে হলো ডিবেটিং ক্লাবের পত্তন। সে-ক্লাবের আসর বসে প্রতি শনিবারে ছুটোর সময়···ছুটি হলে ছুটির পর আমাদের ক্লাশ-রুমে। সে আসরে ইংরেজীতে প্রবন্ধ পড়া এবং ইংরেজীতে পঠিত প্রবন্ধের debate চলে। বাঙলা ভাষায় লেখা, বাঙলা ভাষার চর্চ্চা··· বিশেষ করে স্কুলে···তখন ছিল নিষিদ্ধ—গোমাংসের মতো! বাঙলা প্রবন্ধ পড়লে যেন দারুণ অনর্থপাত হবে, এমনি তখনকার কালের বিধি! এ-বিধির ব্যতিক্রম হলো···ঐ বছরেই (১৮৯৭)। প্রথম, হিতবাদী-সম্পাদক কাব্যবিশারদ মহাশয়ের জেলে যাওয়ায় কবিতা লিখে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলুম। ক্লাশের ছেলেদের কাছে দু আনা, এক আনা চাঁদা তুলে সে শোকোচ্ছ্বাসের কবিতা ছেপে বিতরণ করেছিলুম। হেডমাষ্টার মশায় (৺ বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়) কবিতার সুখ্যাতি করেছিলেন···কিন্তু বলেছিলেন—যে-অপরাধে কাব্যবিশারদ মশায়ের জেল হয়েছে···সে-অপরাধ অমার্জ্জনীয়···সেজন্য এ ব্যাপারে তাঁর জন্য এ দুঃখ-প্রকাশ উচিত হয় নি। দ্বিতীয়বার, তখন উত্তর ভারতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ···সভা-সমিতি করে অনেকে চাঁদা তুলে টাকা পাঠাতে লাগলেন···দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য। স্কুলে-কলেজে এমনি চাঁদা তোলা হতে লাগলো

—আমরাও এক অধিবেশন করে চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করেছিলুম। সে-আসরে ছাত্রেরা করবে বক্তৃতা···হেড-মাষ্টার মহাশয় সভাপতি। আমি বলে-কয়ে তাঁকে রাজী করিয়েছিলুম —বাঙলা ভাষায় বক্তৃতা দেবো। বলেছিলুম—ইংরেজীতে বলতে হলে কোথায় গ্রামারের ভুল হবে···কি বলতে কি বলবো···যা বলতে চাই, তা বলতে পারবো না হয়তো! বাঙলায় বলতে দিলে এ-বিপদ ঘটবে না। তিনি এ-কথা শুনে রাজী হন এবং এ-অধিবেশনে আমি দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের দুঃখ-দুর্দ্দশা বর্ণনা করে···তাঁদের রক্ষার জন্য আবেদন জানিয়ে একটি কবিতা লিখে আসরে পড়েছিলুম। নিজের এত কথা বলার প্রয়োজন আছে বলেই বলছি···কারণ, এই ডিবেটিং ক্লাব থেকেই পরে একদিন সুযোগ মিলেছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আরো একটু ঘনিষ্ঠ-সংযোগ-লাভের।

সে-কথা পরে বলবো। সে-কথা বলবার আগে অন্য কথা আছে বলবার।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা বা তাঁর রচনার বিশ্লেষণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করে সকলের সামনে ধরছি অতীত দিনের কথা···রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন পূর্ব্ব গগনে অপরূপ আলোর আভাস জাগিয়ে মধ্যাহ্ন-গগন উদ্ভাসিত করে তুলতে চলেছে···সেই সময়ের কথা বলছি। এ-যুগে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছেন, তাঁরা

পেয়েছেন তাঁকে পরিপূর্ণভাবে, সম্পূর্ণরূপে—কিন্তু ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমরা দেখেছি উদয়াচল থেকে রবির কিরণ দীপ্তির প্রত্যেকটি পর্য্যায়—সেদিনের সে-কথা রূপকথার মতো শোনাবে হয়তো···তা শোনালেও সে-কথা অতি সত্য।

স্কুলের সেকণ্ড ক্লাশ থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা গল্প পড়া···নেশার মতো আমাদের পেয়ে বসেছিল। আর কারো লেখা পড়বার বাসনা থাকলেও সে বাসনায় উগ্রতা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের প্রভাত সঙ্গীত থেকে তখন···১৮৯৬-৯৭-৯৮ সালে যে সব কাব্য গল্প নাটক প্রভৃতি যখনি যা পেয়েছি, পড়ে পড়ে তা প্রায় মুখস্থ করেছি। তাঁর ভাষা, তাঁর ছন্দ, তাঁর ভাব ···সবই মনকে এমন করে মাতিয়ে তুলতো···মনে হতো, সার্থক জনম আমার · বাঙালী হয়ে তাঁর এ সব লেখা পড়তে পাচ্ছি!

তখন শেলি, কীটস পড়িনি, কালিদাস, সেক্সপীয়র পড়িনি···ইংরেজী কবি বলতে তখন কাউপার, সাদি, লঙফেলো, মিসেস হেমান্স, টমাস হুডের দু-চারটি কবিতার সঙ্গে ইংরেজী পাঠ্যগ্রন্থেই যা পরিচয়। সে সব কবির দু-চারটি কবিতার সঙ্গে সঙ্গে যখন পড়লুম রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

আকাশ এস এস···ডাকিছ বুঝি ভাই···
গেছি তো তোরি বুকে, আমি তো হেথা নাই!
প্রভাত আলো সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর···
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর!

সে-বয়সে আকাশ-বাতাসকে বিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে বিচার করতে শিখিনি···তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করবার জন্য মন হতো আকুল···ও-বয়সে সব ছেলেমেয়েরই তাই হয়! রবীন্দ্রনাথের এ-কবিতা পড়ে মনে যেমন বিস্ময় তেমনি আনন্দ···আমাদের মনে এমনি কথা জাগে, কবি তা কি করে জানলেন? জেনে এমন সুস্পষ্ট করে তা লিখলেন? আমরা তো এ-ইচ্ছার কথা এমন স্পষ্ট করে বলতে পারি না। তারপর পড়লুম আরো কবিতা—

আয়রে আয় সাঁঝের বা—
লতাটিকে দুলিয়ে যা—
ফুলের গন্ধ দেবো তোরে—
আঁচলটা তোর ভোরে ভোরে!

সন্ধ্যা বেলায় গায়ে পরশ-বুলোনো সন্ধ্যার বাতাস··· উঠানের কোণে ঐ লতা, ঐ রজনীগন্ধা ফুল···মায়ের আঁচল— এ-ছত্রগুলি পড়ে চোখের সামনে সব জীবন্ত হয়ে উঠতো! তাঁর ভাব আর ছন্দের এ-বাতাসে মনের কপাট খুলে গিয়েছিল। বালকের বিকচোন্মুখ মন এ-ছন্দের বাতাসে দুলে জেগে উঠতো! এ সব কবিতা পড়ে মনে হতো, এমন কথা তো আর কোনো কবি লেখেন নি! রবীন্দ্রনাথকে মন বরণ করে নিয়েছিল প্রাণের একান্ত স্বজন পরমাত্মীয়ের মতো!

বাল্মীকির কথা ও-বয়সে বাঙালীর ছেলেদের মধ্যে কারো সে-যুগে অজানা ছিল না। আমরাও শুনেছিলুম দস্যু রত্নাকরের গল্প। কৃত্তিবাসের রামায়ণে পড়েছিলুম সে-কাহিনী। কিন্তু যখন পড়লুম রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভা···তখন যেন বাল্মীকিকে জীবন্ত পেলুম, মনে হয়েছিল! দস্যু রত্নাকর লুটপাট করতেন···এইটুকু শুধু কৃত্তিবাসী রামায়ণে দু-চার ছত্রে জেনেছিলুম। তার পর ব্রহ্মা ঠাকুর এবং নারদকে পাকড়ে রত্নাকরের ভয় দেখানো এবং তাঁদের কথায় রত্নাকর বাড়ী চললো তার পাপের ভাগ মা বাপ স্ত্রী পুত্ররা নেবে কি না জানতে এবং তাঁরা নেবেন না বলায় রত্নাকর তপস্যায় বসলেন ···ঘোর তপস্যায়; এবং তপস্যার জোরে তিনি হলেন বাল্মীকি মুনি—রামায়ণ পড়ে শুধু এই পরিচয়ই পেয়েছিলুম তাঁর। পরে বনবাসিনী সীতাকে আশ্রয়-দান এবং লবকুশকে লালন করে তাঁদের রামায়ণ গান শেখানো—বাল্মীকি ছিলেন কৃত্তিবাসী রামায়ণে-পড়া···দেবতার মতো! মানুষ আমরা তাঁকে ধরতে ছুঁতে পার না—এমনি বাল্মীকিকেই শুধু জেনেছিলুম। কিন্তু বাল্মীকি প্রতিভায় মানুষরূপে, দস্যুরূপে পেলুম রত্নাকরকে। দস্যু রত্নাকর···ডাকাতের দলে সর্দার—ও-বয়সে এ জ্ঞান হয়েছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে রত্নাকরের দলকে পাইনি··· শুধু রত্নাকরকেই পেয়েছিলুম। বাল্মীকি প্রতিভায় যখন রত্নাকরের দলকে পেলুম···তখন মনে হয়েছিল, ঠিক···দল না

থাকলে একা একটি দস্যু কতখানি প্রতাপ ফলাবে! তার দস্যুতার খবর শুনে দেশের রাজা পাঠালেন না সেপাই-শান্ত্রী দস্যুকে ধরতে? এ-প্রশ্ন কেবলি মনে জাগতো···কৃত্তিবাসী রত্নাকরের কথায়। বাল্মীকি প্রতিভায় রত্নাকরের দলকে দেখি প্রথমে···দেখি, অসহায় এক বালিকাকে ধরেছে···ধরে তাদের আস্ফালন—বালিকাকে ধরে সর্দার রত্নাকরের কাছে নিয়ে গিয়ে তারা বলছে—

দেখ্ হো ঠাকুর···বলি এনেছি মোরা—
বড় সরেস পেয়েছি বলি সরেস,
এমন সরেস মছলি রাজা—জালে না পড়ে ধরা···
দেরি কেন ঠাকুর, মেরে ফেল ত্বরা।

ছোট বয়সে ডাকাতের গল্প যা শুনি···সে সব গল্পে ডাকাতরা নরবলি দেয় মা কালীর সামনে। মেয়েটিকে ধরে এনে বলি দেবার মতলব···পড়ে গায়ে কাঁটা দিত! মনে হতো, ডাকাত বটে···ভারী নিষ্ঠুর ডাকাত! দলের লোকদের কথায় সর্দার রত্নাকর দিলে হুকুম—

নিয়ে আয় কৃপাণ, রয়েছে তৃষিত শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও ত্বরায়।
লোল জিহ্বা লকলক···তড়িত খেলে চরণে
করিয়ে খণ্ড দিকদিগন্ত ঘোরে দন্ত তায়!

পড়ে শিউরে উঠতে হয়। ডাকাতে-কালী তো···ঘোর

দস্তে দিক-দিগন্ত খণ্ড করেন! এমন বাস্তব ছবি কবিতায় ফুটিয়ে তোলা···মনে হয়েছিল, এ কি সহজ শক্তি কবির! যা লিখেছেন···সে-লেখায় মনে যে-ছবি ফুটলো···তা শুধু জীবন্ত নয়···বাস্তবতার পরিপূর্ণ রূপে সে-ছবি উজ্জ্বল!

তার পর? তার পর কি হলো? ভয়ে ভয়ে পড়া এগিয়ে চলেছে! পড়লুম—মেয়েটি ভয়ে কাঁদলো···কেঁদে ছোট মেয়েটি বললে, দয়া করো অনাথারে···দয়া কর গো··· জর্জ্জর ব্যথায়।

পড়তে পড়তে ভয়ে আমাদেরো বুক ঢিপঢিপ করছে! এখন? মনে প্রশ্ন চলেছে—এখন? কবি লিখলেন—মেয়েটির কান্নায়···তার এ-কথায় সর্দার রত্নাকরের মন বিগলিত হলো। রত্নাকর বললে—

এ কেমন হলো মন আমার!
কেন আসি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে।
···সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে।

পাপ-পুণ্যের ভাগ বিচার করে দস্যুতা ত্যাগ করা নয়··· মানুষের মনের কোমল তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে রত্নাকরকে দস্যুতা ত্যাগ করানো—এইখানেই রবীন্দ্রনাথ বালক-বয়সে (বাল্মীকি প্রতিভা তিনি লিখেছেন বাল্য অতিক্রম করে প্রথম কৈশোরে) মানবতার যে বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন···তার তুলনা নেই!

করুণার প্লাবনে দস্যুর মন বিগলিত হলো…দস্যুতা ত্যাগ করলো রত্নাকর…সর্ব্ব জীবের উপর মায়া-মমতায় রত্নাকরের মন ভরে উঠলো এবং মায়া-মমতাভরা মন নিয়ে যখন তিনি দেখলেন, ব্যাধ ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বধ করলো, মায়া-মমতায় বিগলিত তাঁর কণ্ঠে নিঃসৃত হলো ছন্দে-গাঁথা বাণী—মা নিষাদ ইত্যাদি : তাঁর কণ্ঠে এ-বাণী শুনে দেবী বীণাপাণি এসে সামনে দাঁড়ালেন ! বীণাপাণি তাঁকে বর দিলেন—

আমি বীণাপাণি তোরে এসেছি শিখাতে গান—
তোর গানে গলে যাবে সকল পাষাণ-প্রাণ ।
মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর—
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর !
বসি তোর পদতলে কবিবালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত !

আমার মনে আছে, ১৯০৩।৪ সালে মিনার্ভা থিয়েটার গৃহে—আমি তখন বি-এ পড়ছি—রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন স্বদেশী-সমাজ প্রবন্ধ। সে সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এবং সভায় বহু গণ্যমান্য সুধীর সঙ্গে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন উপস্থিত। প্রবন্ধ-পাঠের পর আলোচনা-প্রসঙ্গে স্যর গুরুদাস বলেছিলেন

—রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা কবি। প্রথম কৈশোরে তিনি বাল্মীকি প্রতিভায় দেবী বীণাপাণিকে দিয়ে বাল্মীকিকে আশীর্ব্বাদ জানিয়েছিলেন—তোর পদতলে বসে কবি বালকেরা যত···শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত শত। রবীন্দ্রনাথের জীবনে দেবী বীণাপাণির এ-আশীর্ব্বাণী সার্থক হয়েছে, সত্য হয়েছে। নব নব গীতে রবীন্দ্রনাথ আজ বিভোর এবং তাঁর স্নেহাশ্রয়ে বসে নব নব কবির দল শিখছে সঙ্গীত শত। স্যর গুরুদাসের সে উচ্ছ্বসিত বাণী যে কতখানি সত্য··· রবীন্দ্র-রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথের বিরাট কর্ম্মজীবনের পরিচয় এবং রবীন্দ্র-ভক্ত লেখকদের পরিচয় যাঁরা জানেন···তাঁরা অকুণ্ঠকণ্ঠে তা স্বীকার করবেন।

রবীন্দ্রনাথ কিভাবে দেশের মানুষকে ধীরে ধীরে নানাদিকে সচেতন করে গিয়েছেন···সে-পরিচয় তাঁর চিন্তা এবং কর্ম্মধারার পর্য্যায় আলোচনা করলে সহজেই উপলব্ধি হবে। জন-সাধারণের চিন্তা-শক্তি কল্পনা-শক্তি তিনি নানা দিক দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বাঙালীর কল্পনাশক্তিকে তিনি শুধু জাগিয়ে তোলেন নি···কল্পনাকে বায়ুলোক থেকে নামিয়ে মর্ত্ত্যলোকে কেন্দ্রিত করেছেন। তাঁর কবিতাতেই প্রথম দেখি, লজিকাল সেন্স-এর সঙ্গে কল্পনার বিচিত্র মিলন-লীলা! এ পরিচয় ক্রমে সাধ্যমত দেবার চেষ্টা করবো।

দুই

দিকে দিকে জাগে আলো

স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজের পড়া সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী পড়া···পড়ে উপলব্ধি করা চললো সমানে। ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ তখন নিয়মিত লিখছেন। এ-সময়ে (১৮৯৯-১৯০০) তাঁর কবিতা, তাঁর চিরকুমার সভা ভারতী পত্রিকায় মাসে মাসে প্রকাশিত হতে লাগলো।

কলেজে ঢুকে মিল্টন, টেনিশন, স্কট প্রভৃতির কাব্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানস-চক্ষে যে বিরাট কাব্যলোক প্রতিভাত হলো, সে কাব্যলোকেরও উর্দ্ধে রবীন্দ্র-কাব্যলোক বিরাট মায়ায় আমাদের চিত্ত আরো বেশী বিমুগ্ধ করতে লাগলো। এ-সময়ে যখন পড়লুম তাঁর লেখা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ···তখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যলক্ষ্মীকে যেন আরো বেশী করে চিনলুম!

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর!
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখীর গান!
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ···ওরে উথলি উঠেছে বারি—
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ···
রুধিয়া রাখিতে নারি।

এ-কবিতা পড়ে শুধু অসীম আনন্দ উপভোগ করিনি··· বিপুল বিস্ময়ে মন আপ্লুত হয়েছিল। পূর্ব্বে যে সব কবির কবিতা পড়েছি, সে সব কবিতায় উচ্ছ্বাসের প্রগলভতায়, ভাবের অসংযমে প্রকৃতির নিয়ম-কানুনে দারুণ অবহেলা, প্রকৃতির নিয়ম-কানুন ছেঁড়ার দৃষ্টান্ত বড় বেশী প্রকটিত দেখতুম—রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় প্রকৃতির কোনো নিয়ম লঙ্ঘিত দেখিনি কখনো। কিশোর বয়সেই তাঁর কবিতায় যে logical sense আগাগোড়া বজায় থাকতে দেখেছি, তাতে সত্যই বিহ্বল হতুম! ঐ কটি ছত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সূর্য্যকর আঁধার গুহায় প্রবেশ করেছে··· সেই সঙ্গে গুহার আঁধারে প্রভাত পাখীর গান পশিল! খুবই স্বাভাবিক—কবির অত্যুক্তি উচ্ছ্বাস নয় এ! এবং আঁধারে এ-আলোর স্পর্শে প্রাণ জেগে উঠেছে···গুহার মধ্যে বারি উথলে উঠেছে (পাহাড়ের গুহায় জল থাকা স্বাভাবিক)। এ কটি ছত্রে যেমন কাব্য, তেমনি সে-কাব্যে প্রকৃতিকে কোথাও লঙ্ঘন করা নেই! Intellect-এর সঙ্গে poesyর এমন গঙ্গা-যমুনা মিলন···রবীন্দ্র-কাব্যের বৈশিষ্ট্য! এ-বৈশিষ্ট্য আগাগোড়া বিদ্যমান দেখা যায়।

তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথের যত কাব্য ছেপে বেরিয়েছিল ···তার কোনোটি পড়তে বাকি ছিল না। কবি যে লিখেছেন ···কবির মনে এই যে আবেগ-তরঙ্গ···কবি এ-তরঙ্গে রুধিতে

পারেন না হিয়া। আবেগ-ছন্দে তিনি গেয়ে চললেন! গাইলেন—

আমি যাব…আমি যাব…কোথায় সে কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ, গাহিব করুণা গান
উদ্বেগ-অধীর হিয়া সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।
ওরে চারিদিকে মোর
এ কি কারাগার ঘোর—
ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্, কারা আঘাতে আঘাত কর।
ওরে, আজ কি গান গেয়েছে পাখী
এসেছে রবির কর!

এ-কবিতা তিনি কত বছর আগে লিখেছেন…তাঁর দীর্ঘ কর্ম্ম এবং কাব্য জীবন সমাপ্ত করে তিনি যখন মহাপ্রস্থান করেছেন—এখন সে-জীবনের দিকে চেয়ে অবাক হই! এ কবিতায় তিনি যে কথা লিখেছিলেন, সে শুধু কবির ক্ষণেক-খেয়ালের উচ্ছ্বাস মাত্র নয়…তাঁর মনের অকপট অভিব্যক্তি! জগতের কোনো কবির মনের এমন অনন্যসাধারণত্ব আর দেখি না!

এ-কবিতা লেখার ইতিহাসটুকু কত তুচ্ছ! সে সময়ে তিনি সদর ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে বাস করতেন—ভোরে ছাদে উঠে সূর্য্যোদয় দেখে তাঁর মনে এ-ভাবের উদয়!

দিকে দিকে জাগে আলো

রবীন্দ্রনাথ নিজে গল্পচ্ছলে বলেছিলেন—সে সূর্য্যোদয় তাঁর জীবনে ঘটেছিল···সেই সূর্য্যোদয়েই তাঁর মনের আঁধার কেটে জীবনে হয়েছিল অরুণোদয়!

সে-বয়সে অবশ্য তাঁর কবিতায় এত গভীর অর্থ সন্ধান করিনি। পড়তুম···পড়ে প্রচুর আনন্দ পেতুম! পড়ে বাস্তব ভুলে যেতুম! সে-বয়সে এতে মন যা পেতো···যে লাভ হতো মনের···পরবর্ত্তী জীবনে যশ বা অর্থলাভ···তখনকার সে-লাভের তুলনায় অতি তুচ্ছ মনে হয়েছে!

তাঁর মনের প্রসার দেখে বিস্মিত হতুম! তখনকার যুগে কবিদের মন ছিল আকাশবিহারী···কল্পনা-বিলাস ছিল তাঁদের কবিতার উৎস; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনের যোগ চিরদিন পৃথিবীর সঙ্গে। শেষ বয়সে তিনি গান গেয়েছিলেন—বড় ভালো বেসেছিনু এই পৃথিবীরে। গানের এ-কথা তাঁর প্রাণের কথা! কৈশোরে তিনি আবেগভরে লিখেছিলেন—

> জগৎস্রোতে ভেসে চলো যে যেথা আছ ভাই।
> চলেছে যেথা রবিশশী চলরে সেথা যাই।
> দেখিব চেয়ে চারিদিকে দেখিব তুলি মুখ···
> কত না আশা, কত হাসি, কত না দুখ সুখ······
> বিরাগ দ্বেষ ভালোবাসা, কত না হায় হায়
> তপন ভাসে, তারা ভাসে, তারাও ভেসে যায়।

* * * জগৎ হয়ে রব আমি, একেলা রহিব না…
মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণা!
আমার নাহি সুখ দুখ পরের পানে চাই…
যাহার পানে চেয়ে দেখি, তাহাই হয়ে যাই।

তিনি আর একদিন গেয়েছিলেন—

আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী!
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী!
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাশরি।

কবি যে বলেছেন—জগৎস্রোতে ভেসে চলবেন… চারিদিকে চেয়ে তিনি চলবেন…মুখ তুলে চারিদিকে সব কিছু দেখবেন—এ'ও কবির ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র নয়…মনের অকপট কথা। সারা জীবন ধরে তিনি জগতের দিকে চেয়ে সকলকে দেখেছেন! দেখেছেন কত না আশা, কত না সুখদুঃখ, কত না দ্বেষ-হিংসা ভালোবাসা!

'মানসী' কাব্যগ্রন্থে পড়ি—পল্লীর মেয়ে শহরে এসেছে বধূ হয়ে। তখনকার যুগে শহরের ছোট-বড় সব সংসারে মেয়েরা থাকেন বন্দিনীর মতো! পল্লীগ্রামে এমন অবরোধ নেই…সেখানে পথে ঘাটে মাঠে মেয়েরা অবাধে যাতায়াত

করেন। পল্লীর মেয়ে শহরের ঘরে বধূ হয়ে বন্দিনী! কিশোরী বধূ! সে বধূর মনের অতি-গোপন বেদনা রবীন্দ্রনাথের তুলিতে কি জীবন্ত হয়েই না ফুটেছে!

'বেলা যে পড়ে এলো জল্‌কে চল।
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে
কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে জল?
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশত্থতল?
কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূ ধূ
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা—
দীঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে
দুধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা···

গ্রামের ছবি চোখের সামনে কি চমৎকার ফুটে ওঠে! পল্লী কেমন—না···অশত্থ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি··· সেখানে ছুটিতাম সকালে! মাঠের পরে মাঠ···মাঠের শেষে সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে! এমন গ্রাম ছেড়ে বালিকা এসেছে শহরে বধূ হয়ে—শহর কেমন লাগছে? হায়রে, রাজধানী পাষাণ কায়া, বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ় বলে··· ব্যাকুল বালিকারে—নাহিক মায়া!

কোথা সে খোলা মাঠ

উদার পথ ঘাট

পাখির গান নাই বনের ছায়া।

কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে—

খুলিতে নারি মন, শুনিবে পাছে।

* * * ইটের পরে ইট

মাঝে মানুষকীট।

নাহিকো ভালোবাসা

নাহিকো মায়া।

ফুলের মালাগাছি

বিকাতে আসিয়াছি—

পরখ করে কেহ, করে না স্নেহ!

পল্লীগ্রাম আর শহরের সঙ্গে তখন যে পরিচয় ছিল…তার দৌলতে এ-বধূর মর্ম্মবেদনা উপলব্ধি করেছিলুম! মনে হয়েছিল, ধনীর ঘরের ছেলে…বিলাস-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পালিত…তিনি কি করে পল্লী-বালিকার এ গূঢ় বেদনা বুঝেছিলেন!

'মানসী'তে এ-সময়ে তাঁর 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' কবিতা পড়ে বেদনায় বুক যেমন ভরে উঠেছিল, নিন্দুকদের নীচ ঈর্ষা, ইতরতা এবং কাব্য-রসবোধে মূঢ়তার পরিচয় পেয়ে

দিকে দিকে জাগে আলো

আক্রোশে মন জ্বলে উঠতো! রবীন্দ্রনাথ এ-কবিতায় লিখেছিলেন—

আমার এ লেখা কারো ভালো লাগে
তাহা কি আমার দোষ?
কেহ কবি বলে, কেহ বা বলে না,
কেন তাহে তব রোষ?

*   *   *   *

এনেছি তুলিয়া পথের প্রান্তে
মর্ম্মকুসুম মম
আসিছে পান্থ যেতেছে লইয়া
স্মরণচিহ্ন সম।
কোনো ফুল যাবে দুদিনে ঝরিয়া,
কোনো ফুল বেঁচে রবে—
কোনো ছোট ফুল আজিকার কথা
কালিকার কাণে কবে!
তুমি কেন ভাই, বিমুখ বচন
নয়নে কঠোর হাসি…
দূর হতে কেন ফুঁশিছ সবেগে
উপেক্ষা রাশি রাশি।
কঠিন বচন ক্ষরিছে অধরে
উপহাস হলাহলে…

লেখনীর মুখে করিতে দগ্ধ
ঘৃণার অনল জ্বলে !

*　　*　　*　　*

দুর্বল মোরা কত ভুল করি
অপূর্ণ কত কাজ···
নেহারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা
আপনি যে পাই লাজ !
তা বলে যা পারি, তাও করিব না,
নিষ্ফল হবো তবে ?
প্রেমফুল ফোটে, ছোট হলো বলে
দিব না কি তাহা সবে ?
হয়তো এ ফুল সুন্দর নয়—
ধরেছি সবার আগে—
চলিতে চলিতে আঁখির পলকে
ভুলে কারো ভালো লাগে !
যদি ভুল হয়···কদিনের ভুল ?
দুদিনে ভাঙিবে তবে।
তোমার এমন শাণিত বচন—
সেই কি অমর হবে ?

কথাগুলি কত খাঁটী···কথাগুলিতে চিরন্তন সত্য প্রতিফলিত !

দিকে দিকে জাগে আলো

এ কবিতা-লেখার ইতিহাস আছে…বলি!

তখন আমরা স্কুলে পড়ি…রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে। এ-বই পড়ে 'হিতবাদী' সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'মিঠে কড়া' বলে একখানি ছোট কবিতার বই বার করেন। 'কড়ি ও কোমল'কে ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথকে ঠাট্টা-টিটকিরী করে মিঠে কড়া লেখা।

'কড়ি ও কোমলে' কটি কবিতা ছিল—অত্যন্ত ঘরোয়া ধরণে লেখা চিঠি। কবিতায় এমন চিঠি রবীন্দ্রনাথের আগে এদেশে কেউ লেখেন নি…আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। কাব্যবিশারদ এগুলিকে টিটকিরী-বাণে কিভাবে বিদ্ধ করেছিলেন…যতটুকু মনে আছে, বলি (মিঠে কড়া বই বোধ হয় আর পাওয়া যাবে না)।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন…তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী বালিকা ইন্দিরা দেবীকে (এখন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী)… লিখেছিলেন—

মনিষ্যি না পক্ষী
মাগো আমার লক্ষ্মী!
কাল ছিলেম খুলনায়—
তাতে আর ভুল নাই!
কলকাতায় এসেছি সত্ত
বসে বসে লিখছি পত্ত!

এমন চমৎকার ঘরোয়া কথা—কাব্যবিশারদ তাঁর মিঠে কড়ায় সমস্ত কবিতাটি উদ্ধৃত না করে ঐ কটি ছত্র বর্জ্জয়েসে ছেপে···তার নীচে স্থূল পাইকায় ছাড়লেন টিটকিরী। কাব্য-বিশারদ লিখেছিলেন—

ভ্যালা মোর বাপ আচ্ছা মদ্দ
মদ্দ বড় বাছের বাছ!
ঠেশ দিয়ে আমরুল গাছ
দেখেছেন পাঁকাঠি—
লেগে গেছে দাঁতকপাটি!

আরো লিখেছিলেন—

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ
বাঙ্গালার মস্ত কবি—
শিখেছি তাহারি দেখে—
তোরা কেউ কবি হবি?

এ-টিটকিরি তো সামান্য···এর চেয়ে বড় টিটকিরি এবং অপযশ তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে পরে। ক্রমশঃ তা বলবো।

কড়ি ও কোমলে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় লেখা আর একখানি চিঠি ছাপা হয়েছিল। তাতে তাঁর লেখা ছত্র ছিল—খোপে বসে পায়রা যেন করছি কেবল বকবকম! এ-ছত্রকে টিটকিরি দিয়ে মিঠে কড়ায় লেখা হয়েছিল—

উড়িস্ নে রে পায়রা কবি, খোপের মধ্যে থাক ঢাকা! তোর বকবকম আর ফোঁশফোঁশানি তাও কবিত্বের ভাব মাখা—তাও ছাপালি গ্রন্থ হলো···নগদ মূল্য এক টাকা।

এখন যে-কথা বলছিলুম—আমাদের কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ এমন নূতন নূতন বাণী শুনিয়েছিলেন···যে সব বাণী আগে আর শুনি নি। তাঁর কবিতা—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে—
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের মেলা চিরতরঙ্গিত
বিরহ-মিলন কত হাসি-অশ্রুময়—
মানবের সুখে-দুখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো করিতে পারি অমর-আলয়!

আমাদের দেশে তখন শঙ্করাচার্য্যের বাণীর রেশ চলেছে—কা তব কান্তা কস্তেব পুত্রঃ···নলিনীদলগতজলমতিতরলম···তদ্বৎ জীবনমতিশয়চপলম্। সকলে বলেন—বৈরাগ্যই হলো মুক্তির উপায়। রবীন্দ্রনাথ সেই সংস্কার-জড়িত যুগে বলে উঠলেন—

বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি···সে আমার নয়—·
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি বহি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়।·········

এই সময়েই ভারতীতে প্রতি মাসে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতো। বৈশাখে পড়লুম—

হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু মুখে তুলি পিনাক করাল
কারে দাও ডাক
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

এ-কবিতা পড়তে পড়তে বৈশাখের রুদ্র রূপ চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল!

বর্ষায় পড়লুম—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।

দিকে দিকে জাগে আলো

শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মত হতেছে বিকাশ
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে !

*　　　　*　　　　*

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।

এমনি করে তাঁর কবিতা-গানের বিচিত্র ছন্দে সুরে আমাদের কিশোর-চিত্ত তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছিল ! সে-বয়সে বিচিত্র রচনার মধ্য দিয়ে তাঁকে নিবিড়ভাবে পেয়েছিলুম—সে-পাওয়ায় জীবনকে কতখানি সার্থক করে তুলতে পেরেছি—পৃথিবীর সমাজের মাপকাঠিতে সে-পাওয়ার কোনো দাম না থাকলেও···নিজের অনুভূতি-উপলব্ধির মাপকাঠিতে বুঝি···জীবনের একটা দিক সার্থক হয়েছে এবং তা সার্থক হয়েছে শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-কিরণের রশ্মিতে !

কবিতা যেমন পড়তুম···তেমনি পড়তুম তাঁর ছোট গল্পগুলি। ফটিকচাঁদের দুঃখ-বেদনা, পণ্ডিত-মশাই গল্পের সেই ছেলেটি ; ব্যবধান গল্পের সেই দুটি বালকের নিবিড় প্রীতি-ভালোবাসার বন্ধন···অভিভাবকদের বিরোধে তাদের ছাড়াছাড়ি এবং সে-ছাড়াছাড়িতে দুজনের বেদনার

নিশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত যেন শুনতে পেয়েছি! তাদের বেদনা নিজেদের বেদনার মতোই উপলব্ধি করেছি। এক-একটি গল্পে আমাদের মনের প্রসার বেড়েছে কতখানি…মর্ম্মে মর্ম্মে তা উপলব্ধি করেছি। এখনকার কিশোরদের মন ভোলাতে মেকি প্রলোভনের বহর এত বেড়েছে…বাজে বই, সিনেমার আজগুবি ঢং এবং চারিদিকে রঙ-রাঙতার জলুশ ··আমাদের কিশোর বয়সে এসব ছিল না—সেজন্য দুঃখ বোধ করি নি…কারণ আমরা তখন রবির কিরণে নিজেদের উজাড় করে ধরতে পেরেছিলুম!

'ভারতী' পত্রিকা তখন বাঙলা মাসের পহেলা তারিখে বাহির হতো। ভারতীর বিজ্ঞাপনে লেখা থাকতো—ভারতী ঘড়ির কাঁটার মতো চলে। এ-বিজ্ঞাপনীতে বাজে কথা ছিল না। সত্যই বাঙলা মাসের পহেলা তারিখে ভারতী বেরুতো… শুধু তাই নয়, সরলা দেবীর সম্পাদনার গুণে ভারতীতে পরের মাসে কি কি গল্প প্রবন্ধাদি বেরুবে, তার অনেকগুলির নাম লেখকদের নাম-সমেত বিজ্ঞাপনী-পত্রে জানানো হতো। আমরা উন্মুখ থাকতুম…উদগ্রীব থাকতুম…সামনের মাসে রবীন্দ্রনাথের আবার কি নূতন লেখা পড়বো!

এ-ছাড়া পুরানো লেখা পড়ার বিরাম ছিল না। ১৮৯৯-১৯০০ সালের কথা বলছি—সে-সময়ের মধ্যে তাঁর এত বই বেরিয়েছিল…কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস…যে পড়ার বইয়ের

অভাব ঘটেনি এবং এ-সময়ে বেরিয়েছিল প্রকাণ্ড কাব্য-গ্রন্থাবলী—দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে একখানি টালির মতো…স্থূলতায় টালির ডবল। সে-গ্রন্থাবলীতে…তখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত যত কবিতা, নাট্যগ্রন্থ এবং গান ছিল সংগৃহীত। সেই কাব্য-গ্রন্থাবলী ছিল আমার সাথের সাথী। পড়তুম… বারবার পড়তুম…পড়ে পড়ে অনেক কবিতা, অনেক গান, নাটকের অনেক উক্তি-প্রত্যুক্তি মনে গেঁথে গিয়েছিল…এমন গাঁথা যে আজো তার অনেক গান, অনেক কবিতা, নাটকের উক্তি-প্রত্যুক্তি মুখস্থ বলতে পারি।

তখন আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছিল 'রাজা ও রাণী'। তখন-পর্য্যন্ত রাজা-রাণীর কথা নিয়ে যে সব নাটক বা উপন্যাস পড়েছিলুম…সে সব নাটকের রাজা-রাণীদের আমাদের মতো সহজ মানুষ বলে পাইনি। সে সব রাজা-বাদশারা সাজ-পোষাক পরে সভায় বসেন—এর গর্দ্দানা নেন…তাকে মনশবদারী দেন…রাণী বা বেগম…তাঁদের সঙ্গে বসে দুদণ্ড বিশ্রম্ভালাপ করেন না…শুধু তাঁদের প্রতাপ দেখি আর হুঙ্কার শুনি! কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসে, রাজা ও রাণী নাটকেই মানুষের মতো রাজা-রাণী, রাজপুত্র-রাজকন্যার প্রথম পরিচয় হয়েছিল আমার।

বৌঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসে রাজা প্রতাপাদিত্য হুঙ্কার আর প্রতিপত্তি দেখালেও তাঁকে মনে হয়েছে, বোনেদী জমিদার।

ভয়ানক ঝাঁজ-মেজাজী···নিজের অহঙ্কারে মট-মট করছেন ··
বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার উপর কড়া শাসন চালাতে ওস্তাদ—
এমন ধরণের কর্ত্তা আমরা সে-বয়সে দেখেছি বৈ কি!
তাঁকে তাই প্রতাপশালী বাড়ীর কর্ত্তা বলে বুঝে নিতে বিলম্ব
হয়নি। প্রতাপশালী রাজা হলে তাঁকে হয়তো দূর থেকেই
সেলাম জানাতুম···এবং তিনি প্রতাপশালী কর্ত্তাবাবু বলেই
তাঁর আচার-ব্যবহারে ভয় হতো। কিন্তু রাণী—যেমন
বাঙালীর সংসারে দেখা যায়, কর্ত্তার ঝাঁজ মেজাজ থেকে ছেলে-
মেয়েদের আগলে রাখতে মায়ের চেষ্টা···রাণী ঠিক তেমনি।
তিনি রাণী হলেও ছেলেমেয়ের মা বলে তাঁকে চিনতে পারি!
আর ছেলে উদয়, মেয়ে বিভা, পুত্রবধূ সুরমা···আজো
বলবো—রাজপুত্র, রাজকন্যা, রাজবধূর ছাপ মারা থাকলেও
এঁদের মনে হয়েছিল, আমাদেরি মতো মানুষ এঁরা!
ভগ্নীপতি রামচন্দ্রকে বাঁচাবার জন্য উদয়ের প্রাণান্ত পরিশ্রম
এবং ত্যাগ—মনে তখন যে-দাগ কেটেছিল এখনো সে-দাগ
মিলিয়ে যায় নি!

তার পর রাজা ও রাণী নাটক। রাজা বিক্রমদেব রাজার
বিক্রম দেখিয়েছিলেন···কিন্তু কখন? রাণী সুমিত্রা যখন
তাঁর সঙ্গ-সাহচর্য্য ত্যাগ করে পিতৃকুলের অত্যাচারী সামন্তদের
তাড়াবার জন্য পণ নিলেন। যে-স্ত্রীলোকের মর্য্যাদাবোধ
আছে···বাপের বাড়ীর লোকজন স্বামীর গৃহে নিরাপদ আশ্রয়

এবং সম্মান পেয়ে যদি স্বামী-গৃহের লোকজনের উপর নির্য্যাতন নিগ্রহ করে···তাহলে মর্য্যাদাবোধসম্পন্না কোনো রাণী তা সহ্য করতে পারেন না—প্রধানত পিতৃকুলের অপযশের ভয়ে! তার পর স্বামীর ঘর নিজের ঘর এবং নিজের ঘরে যারা অবশ্য প্রতিপাল্য···তাদের রক্ষা করে নিজের ঘরে শান্তি এবং সম্মান রক্ষা করেন। রাণী সুমিত্রাকে তাই রাণীর চেয়ে বড় করেই দেখেছি—First a woman, then a queen. কুমার সেন রাজপুত্র···কিন্তু শুধু রাজপুত্রই তিনি নন···বীর্য্য শৌর্য্য দিয়ে গড়া মামুলি গল্পের রাজপুত্রও তিনি নন! তাঁর মনে আছে স্নেহ-ভালোবাসা··· তাঁর মনে আছে তেজ—যে বস্তুগুলি ভদ্র-শিক্ষিত মানুষ মাত্রেরই থাকে! ইলার সঙ্গে তাঁর কথা···তিনি বাল্যকালের কথা বলছেন—বোন সুমিত্রা আর ভাই কুমার সেন দুটিতে একসঙ্গে বেড়ে উঠেছিলেন···সেই বোনের স্মৃতিতে মন ভরে আছে। আমরা যাদের ভালোবাসি···তাদের কাছেই অতীত দিনের মধুময় স্মৃতির কাহিনী বলি। কুমার সেন ভালোবাসেন ইলাকে। তাই ইলার কাছে বোনের কথা বলবেন—খুব স্বাভাবিক। নাটকে উপন্যাসে রাজা-রাণীর দলকে কখনো স্বাভাবিকভাবে পাইনি—তার কারণ. human element বাদ দিয়েই সে-সব রাজা রাজপুত্রদের গড়েছেন তাঁদের বিধাতা লেখকের দল। রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি···

তিনি রাজপুত্রের কথা লিখতে বসে ভুলে যান নি যে রাজপুত্রও মানুষ—তাঁর রচনার এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে আমাদের কিশোর মনে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে দ্বিধামাত্র করেনি।

কুমার সেন বলেন ইলাকে ছেলেবেলার কথা···বোন সুমিত্রার কথা। কিন্তু এ-কথা শুনে ইলার কি মনে হয়? কি মনে হওয়া স্বাভাবিক? যাঁকে খুব ভালোবাসি, তাঁর কাছে যদি কেবল বলি, অমুককেও খুব ভালোবাসতুম এবং এ-কথা বারবার বলি, তাহলে প্রিয়জনের মনে একটু খেদ হয় বৈ কি! প্রিয়জন ভাবে, তাইতো···মানুষটা আমাকে ভালোবাসলেও আর একজনকেও খুব বেশী ভালোবাসতো! ইলারও তাই মনে হতো! মনে হওয়া স্বাভাবিক। কেন না ইলা মানুষ···নাটক-নভেলের আদর্শ নায়িকা নয়! প্রথম-ভাগের গোপাল হলো নাটক-নভেলের আদর্শ নায়ক। ইলা সে-ধাতের নন···সে-ধাতের মানুষ ভগবানও গড়েন নি। কথায় বলে, দোষে-গুণে মানুষ—কিন্তু আদর্শ মানুষ গড়তে বসে কজন লেখক তা খেয়াল করেন? রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকা মানুষ।

কুমার সেনের কাছে ইলা তাই স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন—

যখন তোমার কাছে সুমিত্রার কথা
শুনি বসে, মনে মনে ব্যথা যেন বাজে!

মনে হয়, সে যেন আমায় ফাঁকি দিয়ে
চুরি করি রাখিয়াছে শৈশব তোমার
গোপনে আপন কাছে। কভু মনে হয়,
যদি সে ফিরিয়া আসে বাল্যসহচরী,
ডেকে নিয়ে যায় সেই সুখ-শৈশবের
খেলাঘরে—সেথা তারি তুমি। সেথা মোর
নাহি অধিকার।

প্রথম-প্রণয়ে-ভীতা সঙ্কুচিতা বালিকার মনের কি স্পষ্ট আভাস এ কটি ছত্রে! সরলা ইলা…পৃথিবীর মাটিতে পা ফেলে যাত্রা সুরু করবে…ভীরু-মন কিশোরীর প্রণয়-বিকাশের এমন মধুর ছবি রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বাঙলা সাহিত্যে পাইনি—তখন অবশ্য বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে যেটুকু পরিচয়… তার মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের রাজা-রাণী, রাজপুত্র-রাজকন্যা…রবীন্দ্রনাথের ফটিকচাঁদ…তাঁর অক্ষয়, পুরবালা, জগত্তারিণী, পূর্ণ…তাঁর চন্দর, নলিনাক্ষ, বিনোদ, ক্ষান্তমণি, ইন্দুবালা, কমলমণি—এঁদের সকলকে নিমেষের জন্য মনে হতো না, কেতাবের জীব! মনে হতো, আমাদেরি মতো রক্ত-মাংসের জীব এঁরা! বাঙলা সাহিত্যে এই যে জীবন জাগিয়ে তোলা…এই গুণেই আমাদের কিশোর চিত্ত শুধু তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েনি… এ থেকে আমাদের চিত্ত যে আলো পেয়েছিল, তাতে মন

আলোয়-আলো হয়ে উঠেছিল! লেখায় কোথাও এতটুকু অত্যুক্তি নেই···আজগুবি উচ্ছ্বাস নেই···মাষ্টার মশাইয়ের মতো উপদেশের হুঙ্কার নেই—সাহিত্যে তিনিই এনেছেন intellect!

ভাবের নব নব বিকাশের সঙ্গে ছন্দের বৈচিত্র্য—ভাষায়, ভাবে, ছন্দে, ঐশ্বর্য্যে শুধু অপূর্ব্ব নয়···যুক্তির বলেও মনকে এমন অধিকার করে বসলো, আমরাও সাহিত্য-সাধনায় মেতে উঠলুম···তাঁকে গুরু বলে মেনে নিয়ে একলব্যের মতো গোপন-সাধনায়!

এমনি ভাবেই রবীন্দ্র-রচনাবলীর নিত্য নবস্রোতে মন ভেসে চলেছিল···১৮৯৯-১৯০১ সালে। তার মধ্যে চলেছিল কলেজের প্রথম জীবনটুকু। রবীন্দ্রনাথের দেখা পাই না···শুধু সুদূর গৃহকোণে বসে তাঁর লেখা পড়ি। মাঝে মাঝে শুনি তাঁর লেখা-গান···অত্যন্ত-পরিচিত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে···যেদিন শুনলুম সেই গান—

অয়ি ভুবন মনোমোহিনী
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণ—
জনক-জননী-জননী!
নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণতল
অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল

অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্রতুষার কিরীটিনী!
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য—
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্য পীযূষ স্তন্যবাহিনী।

সেদিন চমৎকৃত হয়েছিলুম। ছন্দে-সুরে, কত অল্প কথায় ভারত-জননীর কি রূপই না ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ!

পড়লুম তাঁর সনেট—

সাতকোটি সন্তানেরে হে বঙ্গজননী,
রেখেছো বাঙালী করে—মানুষ করোনি!

পড়েই মনে হয়েছিল, ঠিক তো! এ-কথা দেশের যাঁরা নেতা, তাঁরা কখনো বলেন নি তো!

তখন কংগ্রেসের নামে আমরা স্কুল-কলেজের ছেলেরা মাতোয়ারা। বড়দিনের সময় কোনো বছর বোম্বাইয়ে, কোনো বছর কলকাতায়···কোনো বছর লাহোরে হয় কংগ্রেসের অধিবেশন। আমরা সশ্রদ্ধ আগ্রহে দেখি, কোন্ মনীষী হলেন সভাপতি এবং তাঁর বক্তৃতা পড়ি কাগজে ছেপে বেরুবামাত্র। রেজলিউশনের পর রেজলিউশন চলে··· পড়ি। পড়ি—কংগ্রেস থেকে চললো আবেদন ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর কাছে···এই করো, ওই করো! আমরা ভাবি,

এবারে ইংরেজ শুনবে। কিন্তু কোথায় কি? কিছু হয় না! তবু আমরা কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকি। এমন সময় রবীন্দ্রনাথের 'গান' পড়লুম—

মিছে কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা
চোখে নাই কারো নীর—
নিবেদন আর আবেদনের থালা
বহে বহে নত শির।

* * *

যদি মান পেতে চাও,
প্রাণ পেতে চাও,
প্রাণ আগে করো দান!

পরে যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার সৌভাগ্য হয়েছিল…তখন কংগ্রেসের এই বহু অর্থ ব্যয় করে বছর বছর কান্নাকাটি আর আবেদন পেশ করার বিরুদ্ধেই তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি যেভাবে দেশের সেবা করতে বলতেন…কিন্তু সে-কথা পরে যথাস্থানে বলবো।

এখন বলছি, তাঁর রচনাবলীর অগ্রগতির সঙ্গে আমাদের এবং সে-যুগের মুষ্টিমেয় একদল কিশোর-চিত্তের অগ্রগতির কথা।

তখন আমাদের সেকণ্ড ইয়ার ক্লাশ…ক্লাশে প্রায় দেড়শো ছেলে…এই দেড়শোর মধ্যে আমরা ছ-সাতজন মাত্র

রবীন্দ্রনাথের রচনায় মশগুল—রবীন্দ্র-ভক্ত। ভারতী পত্রিকায় মাসে মাসে তাঁর কবিতা বেরোয়···আমরা ছ-সাতজন সতীর্থ সুহৃদ পড়ি···পড়ে তার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য নিয়ে আলোচনা করি। ক্লাশে সাত-আটজন সতীর্থ দেন টিটকিরি! আজো মনে আছে, ভারতীতে যখন বেরুলো নববর্ষার কবিতা—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।

তখন একজন ছাত্র—ইনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দশ টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিলেন···আমরা পাই নি; কাজেই তিনি সেই দশ টাকার জোরে স্কলার! তিনি ভাবতেন, তাঁর মতো পণ্ডিত এবং সমঝদার ক্লাশে আর নেই! তিনি ক্লাশে দু'হাত তুলে নাচতে সুরু করেছিলেন···হাসতে হাসতে বলেছিলেন—হৃদয় কি করে নাচে, জানি না···ধড়টাই তো নাচে। তার পর আবার—শত বরণেব ভাব-উচ্ছ্বাস··· কলাপের মতো করেছে বিকাশ। বাজার থেকে এক গোছা ময়ূর-পালক কিনে এনে বুকে এঁটে নাচবো! আমাদের উদ্দেশ করে তাঁর আস্ফালন—মানে বুঝিয়ে দাও তো বাবুরা। রাগে আমি জবাব দিয়েছিলুম—এর মানে এ-জন্মে তুমি বুঝতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝতে হলে পূর্ব্বজন্মের

সুকৃতি থাকা চাই! তুমি ট্রিগনমেট্রি বোঝো গে…ওর বেশী বোঝবার শক্তি তোমার এ-জন্মে হবে না!

আমাদের দলটির তাঁরা নাম দিয়েছিলেন—রৈবিক!

রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে এম-এ, পি-আর-এসদের মধ্যে অনেকেরই ছিল ধারণা—বড়লোকের ছেলে…তাকিয়া ঠেস দিয়ে মোসাহেব প্রতিপালন না ক'রে, কলম হাতে যা খুশী লিখছেন…স্তাবকের দল হাততালি দিচ্ছে! দেশের এই আবহাওয়া! তাঁদের সঙ্গে আমরা তর্ক করতুম না! কারণ, জনশনের অমূল্য বাণী মনে জাগতো—মানুষকে যুক্তি দিতে পারি…কিন্তু আক্কেল বা বুদ্ধি দিতে পারি না!

এমনিভাবেই দিন চলেছে…তার পর ১৯০১ সাল। ভবানীপুরের সাবার্বন স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাশে পড়বার সময় যে ডিবেটিং ক্লাব খোলা হয়েছিল…তার নাম ছিল South Subarban Students' Union—এ-নামের জন্য স্কুল থেকে পাশ করে যে-সব ছাত্র কলেজে ঢুকেছেন…তাঁরা সদস্য থাকতে পারেন না। কিন্তু এ-সময়ে প্রাক্তন ছাত্রদের সদস্য করে নেবার জন্য ও-নাম বদলে ক্লাবের নতুন নাম হলো Excelsior Union. এই ইউনিয়নে বন্ধুবর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রাণস্বরূপ। তিনি তখন এণ্ট্রান্স ক্লাশে পড়েন…আমার চেয়ে বয়সে তিন বছরের ছোট এবং ক্লাশেও তিন বছরের জুনিয়র।

Excelsior Union নাম হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি এবং আরো কজন প্রাক্তন ছাত্র হলুম তার সদস্য। মণিলালের তখন প্রচণ্ড উৎসাহ...ইউনিয়নের প্রাণ-শক্তি বাড়াতে হবে। সরলা দেবী তখন ভারতীর সম্পাদিকা...তাঁর কাছে যাতায়াত ...তাছাড়া তখন সিষ্টার নিবেদিতা কলকাতায়...তিনি থাকতেন বাগবাজারে—বোসপাড়া লেনে গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীর কাছে। ভগ্নী নিবেদিতার কাছে আমরা যেতুম মাঝে মাঝে। তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হতো। তিনি অনেক ভালো কথা বলতেন। আমাদের দেশের শাস্ত্রে-পুরাণে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান দেখে আমরা তাঁকে খুব ভক্তি করতুম। তিনি বলতেন—পাশ্চাত্য দেশ থেকে আদর্শ নেবার তোমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তোমাদের রামায়ণ মহাভারত পড়ো...পড়ে মর্ম্ম উপলব্ধি করো। তাতে যা পাবে...বিশেষ, মহাভারতে...তা আর পৃথিবীর কোনো শাস্ত্রে-পুরাণে পাবে না। তখন আমাদের মন ছুটেছিল পাশ্চাত্য আদর্শের দিকে। মনে হতো, ও-দেশকে হুবহু নকল করতে হবে। ভগ্নী নিবেদিতার উপদেশে আমাদের মন হয়েছিল দেশ-মুখী! দেশের অতীত গৌরবের উপর শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় মন তিনি ভরিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয়...আমাদের জীবনে নূতন অধ্যায়ের পত্তন করেছিল। এই সময়ে বিবেকানন্দ স্বামীজী পরলোকগমন করেন। Excelsior

Union থেকে আমরা করলুম শোক-সভার আয়োজন। স্থির হলো, সে-সভায় স্বামীজীর সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়বেন ভগ্নী নিবেদিতা এবং সভাপতিত্ব করবার জন্য মণিলাল এবং আমি গেলুম রবীন্দ্রনাথের কাছে ; তাঁকে ধরলুম—সভাপতি হতে হবে। তিনি সম্মত হলেন। এবং এ-সভার অধিবেশন হয়েছিল ভবানীপুরে সাবার্বন স্কুলের হলে। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি এবং ভগ্নী নিবেদিতা করেছিলেন স্বামীজীর জীবন এবং কর্ম্মধারার আলোচনা করে প্রবন্ধ পাঠ!

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে আবার আমি পেয়েছিলুম এবং এর পর থেকে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে গিয়েছি দেখা করেছি। লেখার সম্বন্ধে কত কথা হয়েছে। মনে কোনো সঙ্কোচ না রেখে কত কথা বলেছি। তিনিও সমবয়সী বন্ধুর মতো—মাষ্টার মশাইয়ের মতো নয়—কত উপদেশ দিয়েছেন।

তাঁর কাছেই শুনেছিলুম, 'হিতবাদী' সাপ্তাহিক পত্র যখন বেরোয়···তখন সেই কাগজের জন্যই তিনি সব প্রথম ছোট গল্প লেখেন। আশ্চর্য্য হয়েছিলুম—হিতবাদী সাপ্তাহিক পত্রে তাঁর লেখা ছোট গল্প! রবীন্দ্রনাথ বলে-ছিলেন—কংগ্রেসের প্রচার-কাজ চলবে···এই উদ্দেশ্যে ১৮৯১ সালে হিতবাদী পত্রিকার জন্ম। হিতবাদী প্রিন্টিং এ্যাণ্ড পাবলিশিং কোম্পানি খোলা হয়। সতেরোজন ছিলেন কোম্পানির অংশীদার—নবীন বড়াল (ধনী), ভূপেন্দ্রনাথ

বসু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর আর, এল, দত্ত, জানকীনাথ ঘোষাল, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ও, সি, দত্ত, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমণী-মোহন চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রভৃতি। হিতবাদীর সম্পাদক হয়েছিলেন আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

তিন

অরুণ-রথে জয়যাত্রা

১৯০১ সালে···তখন আমি বি-এ পড়ি···আমরা কজন বন্ধু মিলে সাহিত্য-আলোচনার জন্য ছাত্র-সমিতি খুলি এবং সমিতি থেকে হাতে-লেখা মাসিকপত্র বার করি। সে কাগজের নাম দেওয়া হয় 'তরণী'। আমাকেই কবিতা, প্রবন্ধ সংগ্রহ করে নিজের হস্তাক্ষরে সেগুলি লিখতে হতো—সম্পাদনার ভার ছিল আমার হাতে। সেই পত্রিকায় আমার গল্প লেখার হাতেখড়ি! সকলে প্রবন্ধ লেখেন, কবিতা লেখেন···গল্প কেউ লিখতে চান না···অথচ ছোট গল্প না হলে কাগজ বার করার অর্থ হয় না—অগত্যা আমাকে ছোট গল্প লিখতে হলো। এর আগে একবার গল্প লেখবার চেষ্টা করেছিলুম—এণ্ট্রান্স পড়বার সময় পাঠ্যগ্রন্থে মেরিয়া এ-জোয়ার্থের লেখা Tarlton গল্পটি ছিল

পাঠ্যতালিকাভুক্ত ··সে-গল্পটি অবলম্বন করে বাঙালী ছেলেদের ব্যাপার নিয়ে আমি গল্প লিখেছিলুম। কাজেই আমি যখন একটি গল্প লিখেছি···তখন গল্প আমারই লেখবার কথা। পর-পর কটি গল্প তরণীতে লিখেছিলুম এবং তার এক-একটি গল্প ১৯০২, ১৯০৩ আর ১৯০৪ সালে কুন্তলীন গল্প প্রতিযোগিতায় পর-পর পাঠাই। প্রথমে পাই পাঁচ টাকা পুরস্কার, দ্বিতীয় গল্পে পাই দ্বিতীয় পুরস্কার পঁচিশ টাকা এবং তৃতীয় গল্পে প্রথম পুরস্কার ত্রিশ টাকা। প্রথম পুরস্কার পাবার পর 'সাহিত্য' পত্রের সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি মহাশয় নিজে থেকে 'তরণী'তে লেখা আমার কটি গল্প তাঁর সাহিত্য পত্রে ছাপিয়েছিলেন।

আমাদের সাহিত্য সাধনা এমনিভাবে অগ্রসর হয়ে চললো···রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ মেনে লেখা চলছিল। তার পর দুটি ঘটনা—প্রথমটি, ১৯০৪ সালে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ'। সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। সভায় বহু গণ্যমান্য সুধী গুণী উপস্থিত ছিলেন। আমি কোনোমতে অধিবেশনের দু ঘণ্টা আগে গিয়ে অডিটোরিয়ামে সামনের দিকে স্থান সংগ্রহ করেছিলুম। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠ কখনো শুনি নি···তবে লোক-মুখে শুনেছিলুম, বাঙলা এমন সুন্দর সুস্পষ্ট পড়া যায় সভায় দাঁড়িয়ে···সে-ধারণা ছিল

তাঁদের স্বপ্নাতীত! যথাসময়ে মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্যর গুরুদাস প্রভৃতি আসন গ্রহণ করলেন এবং রবীন্দ্রনাথ করলেন তাঁর প্রবন্ধ পাঠ। লোকে লোকারণ্য থিয়েটার-গৃহ…নিস্তব্ধ বসে সকলে শুনলো। সারা গৃহে এমন স্তব্ধতা যে ছুঁচ পড়লে সে-শব্দও শোনা যায়! কণ্ঠে ভাষার সাবলীল স্রোত বয়ে চলেছে যেন… স্বরগ্রামে বাঁধা…সে যে কত অপূর্ব্ব…বলে বোঝানো যায় না! শুনে মনে হলো, যিনি সুন্দর…তাঁর সব সুন্দর হয়! প্রবন্ধ পাঠের পর অনেকে কিছু কিছু বললেন। স্যর গুরুদাস বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বালক-বয়সে বাল্মীকি প্রতিভা লিখেছেন…তাতে দেবী বীণাপাণির কণ্ঠে যে আশীর্বাণী রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন…বাল্মীকিকে দেবীর আশীর্বাণী ··সে-বাণী রবীন্দ্রনাথের জীবনে সার্থক হয়েছে! তাঁর সুরে ভারতের আকাশ-বাতাস প্লাবিত…তাঁর পদতলে বসে নবীন কবিদের কাকলী আজ দেশকে স্পন্দিত, মুখরিত করে তুলেছে! এ সম্বন্ধে স্যর গুরুদাস আরো যা বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথকে যেদিন দেশের মানুষ সম্বর্দ্ধিত করেছিল ১৩১৬ সালে কলকাতার টাউন হলে সভা করে—সে কথা যথাক্রমে বলবো।

দ্বিতীয় ঘটনাটির কথা বলি এবার। ১৯০৪ সালেই আশ্বিন মাসে আমাদের সমিতির বার্ষিক উৎসব-অধিবেশন

হয় ভবানীপুরে সাবার্বন স্কুলের হলে। এ-অধিবেশনে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন সভাপতি। আমি পড়েছিলুম এ অধিবেশনে প্রবন্ধ 'দরিদ্র ভারত'। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের ভাষা এবং ভাব এমন বিজড়িত ছিল যে সে-কথা বলবার নয়। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়ে পড়ে তাঁর রচনা-রীতি এবং ভঙ্গী আমাকে পেয়ে বসেছিল! পড়েছিলুম ...রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ এবং ভঙ্গী হুবহু অনুকরণ করে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠ শোনেন নি...এমন অনেকে বলেছিলেন, —বাঙলা এমন চমৎকার করে পড়া যায়...বাঃ! কিন্তু এ 'বাঃ'র মর্ম্ম আমি তো বুঝলুম...কাজেই তাতে বিচলিত হইনি। পণ্ডিত শিবনাথ তাঁর ভাষণ দিতে উঠে আমার লেখার, রচনাভঙ্গী প্রভৃতির খুব সুখ্যাতি করলেন; তারপর আমাকে কাছে ডেকে কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন— ছ মাস রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা পড়বে না। এ-কথা যদি না শোনো...রবীন্দ্রনাথের রচনার রীতি-ভঙ্গীতে এমন জড়িয়ে পড়বে যে লেখায় তোমার নিজস্বতা থাকবে না—রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি মাত্র হয়ে থাকবে!

পণ্ডিত শিবনাথের এ-কথা শিরোধার্য্য করে ছ মাস নয় ...একটি বছর আমি রবীন্দ্রনাথের লেখা একেবারে পড়িনি ...নিষ্ঠাভরে এড়িয়ে চলেছিলুম। এর বহুকাল পরে বিচিত্রার আসরে রবীন্দ্রনাথ একদিন মণিলাল, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

সত্যেন্দ্রনাথ এবং আমার রচনা-রীতির কথা তুলে বলেছিলেন—তোমরা আমার সঙ্গে মিশে থেকেও লেখার ভঙ্গী যে স্বতন্ত্র রেখেছো, এতে তোমাদের বাহাদুর বলবো! তোমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের লেখার ষ্টাইল আছে—লেখায় তোমাদের নাম না থাকলেও আমি লেখা পড়ে বলতে পারি··· কোন্‌টা কার লেখা।

তাঁকে তখন বলি পণ্ডিত শিবনাথের উপদেশের কথা। শুনে হেসে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—তিনি বুদ্ধি করে ভাগ্যে প্রথমে তোমার লেখার সুখ্যাতি করেছিলেন···নাহলে, শুধু ঐটুকু বললে তুমি ভাবতে, বুড়োর হিংসা হয়েছে তোমার লেখা শুনে এবং সেজন্য তুমি তাঁর কথা মানতে না!

কলেজে পড়বার সময় আমাদের diversion ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠ। তখন সিনেমার সদ্য-জন্ম হলেও তাতে নেশা লাগবার মতো কিছু ছিল না! সিনেমার ছবি কালে-ভদ্রে দেখবার সুযোগ মিলতো···যখন শীতকালে কোনো বিলাতী কোম্পানি দু-চার হপ্তার জন্য কলকাতায় এসে সিনেমার ছবি দেখিয়ে যেতো। সিনেমা আজ যেমন তরুণজনের জীবনের অঙ্গস্বরূপ হয়েছে, তখন তা ছিল না এবং তা হতে পারে, এমন কল্পনাও কারো মনে স্থান পায় নি! বর্ষাকালে কলকাতার মাঠে ফুটবলের ম্যাচ চলতো। গোরাদের সঙ্গে

ম্যাচ খেলায় বাঙালী যদি জেতে···এ-আশায় মন বড়-জোর দুমাস বিক্ষিপ্ত থাকতো···তাও ফুটবল-ম্যাচ দেখবার মতো মন ছিল তখন কজন ছাত্রের! ক্রিকেট-ম্যাচ দেখা ছিল অত্যন্ত সৌখীন সমাজের বাতিক। এ ছাড়া অন্য কোনো আমোদ-প্রমোদ ছিল না···ছিল শুধু থিয়েটার, কিন্তু থিয়েটার হতো হপ্তায় তিনদিন···তাও আবার রাত্রে! থিয়েটার দেখার বাতিকও খুব বেশী ছিল না। বিশেষ আমাদের বয়সের ছেলেরা থিয়েটার দেখবার সুযোগ পেতো কালে-ভদ্রে—কাজেই আমরা জনকয়েক বন্ধু রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে বিরাম-অবসর যাপন করতুম। পড়া হতো পুরানো সাধনা পত্রিকা থেকে, 'ভারতী' থেকে; রবীন্দ্রনাথের তখনকার দিনে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক। পড়ে সকলের মুগ্ধ তারিফ···কত আলোচনা। তাতে লাভ হয়েছিল এই, সাহিত্য-সাধনায় অনুরাগ এবং সে-সাহিত্য করতে হবে সুন্দর···সর্ব্ব কুৎসিত কদর্য্যতা থেকে নির্মুক্ত। লক্ষ্য করতুম, রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাষার মধ্যে আভিজাত্য···লক্ষ্য করতুম, অপশব্দ বা নোংরা কথার সম্পূর্ণ অভাব। এ দুটি বিষয় তখনকার লেখকদের রচনায় নির্মুক্ত ছিলনা বললে অত্যুক্তি হবে না!

তাঁর কটি গল্পের কথা মনে পড়ছে। সম্পত্তি-সমর্পণ গল্পে বৃদ্ধ জমিদার পিতা···খুব ধাৰ্ম্মিক···কাশীবাসী হলেন—

তাঁর তরুণ গ্রাজুয়েট-পুত্র সম্পত্তি দেখাশুনা করতে লাগলেন। নব্য গ্রাজুয়েট···এথিক্স মেনে চলেন···কেউ ফাঁকি দেবে··· সহ্য করেন না। তিনি দেখলেন, বাপ ঢিলা-ঢালা মনের মানুষ···সেকেলে মানুষ···তাঁর ধর্ম্মজ্ঞানও অন্য রকম···তিনি বহু লোককে জায়গা-জমি যেভাবে দিয়ে গেছেন···তা আইনে বা ন্যায়মতে অন্যায়। গ্রাজুয়েট-পুত্র সে সব পুনরুদ্ধার করতে লাগলেন। শেষে এক বিধবা মুসলমান রমণী এবং তার কিশোর পুত্রের জমিতে পড়লো গ্রাজুয়েট-পুত্রের নজর। গ্রাজুয়েট-পুত্র আদালতে মকর্দ্দমা করে সে-জমি ছিনিয়ে নেবেন···উকিলের দল ভরসা দিয়েছেন—গ্রাজুয়েটের দাবী হক-দাবী···আইনের সাধ্য নেই, সে-দাবী নামঞ্জুর করে। বিধবা মুসলমানী কেঁদে এসে পড়লে···গ্রাজুয়েট বলেন—হঠ যাও! অবশেষে কাশী থেকে বৃদ্ধ পিতা এলেন···এসে বললেন—ও-জমি নিতে পারবে না···ও-জমি ওদের! গ্রাজুয়েট-পুত্র বললেন—কি করে? বাপ বললেন—কারণ ঐ বিধবার পুত্র তোমার ভাই···আমার সন্তান।

গ্রাজুয়েট-পুত্র ঘৃণায় নাসা কুঞ্চন করলেন—সেকেলে মানুষগুলোর এমনি বটে mentality.

শেষের দুটি ছত্রে কত কথা বললেন রবীন্দ্রনাথ। কোথাও নেই এতটুকু কদর্য্য ইঙ্গিত। মুসলমান রমণীর সঙ্গে বাপের সম্পর্ক সমাজগর্হিত হলেও···তাঁর এ-বয়সে কাশী থেকে

এসে এ-স্বীকৃতি···বৃদ্ধ পিতাকে যে মহিমা দান করলো, তা অপূর্ব্ব···উপভোগের বস্তু!

আর একটি গল্প—ষ্টাটুটরী সিভিলিয়ান···তরুণ বয়সে এক রমণীকে করেছিলেন পথভ্রষ্টা···তার পর নিজের পিপাসা চরিতার্থ হলে তাকে ত্যাগ করে ষ্টাটুটরী সিভিলিয়ান···মই বয়ে সমাজের চিলকোঠায় উঠে বসেছেন—ওদিকে সে-নারী অধঃপাতের চরম সীমায় নেমে শেষে জেল-হাজতে। সেখানে ষ্টাটুটরী সিভিলিয়ান জেল-পরিদর্শনে এলে এ-নারী জানালো কাঁদতে কাঁদতে নালিশ—ওগো হাকিম সাহেব, জমাদার আমার আংটি নিয়েছে···সেটি দিতে বলো।

আংটি এলো·· ষ্টাটুটরী সিভিলিয়ান দেখলেন। দেখলেন, শীল-আংটি···তাতে নাম লেখা···সে নাম ঐ হাকিমেরই। তাঁর মনে পড়লো, এটি তিনিই দিয়েছিলেন তরুণ বয়সে তাঁর উপর বিশ্বাস করে যে-বিধবা কুলত্যাগিনী হয়েছিল···তাকে। হাজতের এ-আসামী রমণীটি তবে······

ছোট ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ এ-গল্পে পুরুষের লালসার যে ছবি এঁকেছেন·· সে-ছবির কোনোখানে কলঙ্ক-কালির কালো রেখা পড়ে নি। অপূর্ব্ব রচনা। অথচ এ-কথাও মনে আছে···নিন্দুকের স্বভাব···পায়স খেয়ে বলে—যদি আর একটু মিষ্টি বেশী হতো, কি কম হতো···তাহলেই অখাদ্য হতো! অর্থাৎ ভালো হলেও ভালো বলতে এদের বাধে!

এ-গল্পটির সমালোচনা দেখেছিলুম সাহিত্য পত্রে—"বাঙলা দেশে ষ্টাটুটরী সিভিলিয়ানের সংখ্যা খুবই পরিমিত··· রবীন্দ্রনাথের উচিত হয়নি···নায়ককে ষ্টাটুটরী সিভিলিয়ান করা—কেন না, পাঠক-পাঠিকা পড়ে মনে করবেন, তাঁদের কারো জীবনের কথা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ-গল্প লিখেছেন!"

এখনকার পাঠক-সমাজ যদি তখনকার যুগের এ-সব সমালোচনা পড়েন···বুঝবেন, রবীন্দ্রনাথকে কি ভীষণ অনল-সাগরের তরঙ্গ বয়ে লিখতে হয়েছিল নোবেল প্রাইজ পাবার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত! তিনি সত্য কথাই বলে গিয়েছেন—এত বিদ্বেষ, এত অপযশ কোনো দেশের কোনো কবিকে বোধ হয় সহ্য করতে হয় নি! এবং যে-সব রচনার সম্বন্ধে সমালোচকদের টিটকারি-বিদ্রূপ···সেগুলি সব দিক দিয়ে যে-কোনো সাহিত্যে সম্পদস্বরূপ গণ্য হবার মতো!

এখন আবার আগের কথায় আসা যাক :—

রবীন্দ্রনাথের কবিতা নির্ঝরিণী-ধারার মতো ঝরছে তখন···আমরা প্রাণভরে সে-ধারায় অবগাহন করছি··· শুচিস্নাত মনে পৃথিবীকে, সারা পৃথিবীকে এবং পৃথিবীর মানুষজনকে অত্যন্ত আপন করে যেন জানতে পারছি! বিরহিণী রাজকন্যার দুঃখ নিয়ে আমাদের কবি ছন্দ মেলান

না···তাঁর চিত্তে পৃথিবীর সর্ব্বজীবের সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু দিয়েছে দোলা···প্রকৃতি সজীব হয়ে তাঁর কাছে ধরা দিয়ে নিজের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার মুক্ত করে দিয়েছে ; এবং তাঁর লেখা কবিতার প্রসাদে আমরা পাচ্ছি এ-সবের পরিচয়।

মানসীর সেই সব কবিতা—

তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে—
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়ে কি দিয়ে!
মনে গোপনে থাকে প্রেম যায় না দেখা
কুসুম দেয় তাই দেবতায়—
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে···চাহিয়া দেখি তারে
কী বলে আপনারে দিব তাঁয়।

পড়লুম—

তুমিই তো দেখালে আমায়
(স্বপ্নেও ছিল না এত আশা)
প্রেম দেয় কতখানি···কোন্ হাসি, কোন্ বাণী
হৃদয় রাখিতে পারে কত ভালোবাসা।

পড়লুম—'সোনার তরী' কাব্য-গ্রন্থে—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা—

রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হলো সারা
ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা—
কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরষা !

পড়ে চমৎকৃত হতুম। শুধু কি ছত্রে ছত্রে মিল-করা কবিতা···অক্ষরে অক্ষরে ছত্রে ছত্রে ছবি-আঁকা চলেছে ! অবাস্তব কল্পনার ছবি নয়···বাস্তবের ছবি ! যখনি এ-কবিতা পড়েছি···আজ এ-বয়সেও পড়তে বসে···চোখের সামনে জেগে ওঠে—বর্ষার কালো মেঘে ভরা আকাশ, ধানের ক্ষেত··· সে-ক্ষেতে রাশি রাশি কাটা ধান এবং নদী বয়ে চলেছে খরস্রোতে ! ভরা নদী—কূলে কূলে জলে ভরা এবং ঐ যে দুটি কথা 'ক্ষুরধারা' এবং 'খরপরশা'—ও দুটি কথায় নদীর যে-ছবি জাগে, সে ছবি কোনো দেশের কোনো কবির তুলিতে ফুটেছে বলে মনে হয় না !

বিরাট মন, গভীর অন্তর্দৃষ্টিই কবির সম্বল নয়···সে দৃষ্টিতে যা দেখেন, তার পরিপূর্ণ প্রকাশে তেমনি অমোঘ শক্তি ! পড়ে মনে হতো, ধন্য এ-দেশে জনম সার্থক— রবীন্দ্রনাথের দেশ ! এ-কথা আজ লিখতে বসেছি বলে বলছি না···ছোট বয়সেও তাই মনে হতো।

মনে আছে, যখন বি-এ পড়ি···একটি বড় গল্প লিখেছিলুম। সে-গল্প ছাপা হয়নি। সে-গল্পে লিখেছিলুম কালো বৌয়ের দুঃখের কথা। কালো রঙ বলে সৌখীন

স্বামীর অবহেলায় তাঁর দিন কাটতো। তাঁকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতার ছত্রগুলি—তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে…রূপ না দিলে যদি বিধি হে—এ-ছুটি ছত্র বলিয়ে খেদ প্রকাশ করেছিলুম। কালো বৌ বলেছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে এ-কবিতা পড়ে—রবি ঠাকুর, তোমায় আমি জানি না, চিনি না…তুমিও আমাকে চেনো না, জানো না…কখনো আমাকে ছাখোনি—তবু কি করে জানলে আমার মনের বেদনার কথা!

আসল কথা—তাঁর কবিতার এক-একটি ছত্র মনে জাগায় প্রেরণা—inspiration…সে-ছত্র অবলম্বন করে মানব-মানবী-চিত্তের সুখ-দুঃখের কত গল্প না মানুষ লিখতে পারে! আমাদের প্রথম বয়সে সে চেষ্টা চলতো। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব থেকে প্রেরণা পেয়ে দু-চারটি গল্প তখন লিখেছিলুম। তাঁর রচনা পড়েই সে যুগের কত সাহিত্য-পথচারীর মিলেছিল এ-পথে যাত্রার হদিশ!

'সোনার তরী'তে তাঁর বসুন্ধরা কবিতা: কবি লিখলেন বসুন্ধরাকে উদ্দেশ করে—আমারে ফিরায়ে লও… তোমার সন্তানে তব কোলের ভিতরে—তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে যাই…দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া—নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি, বিচিত্র বর্ণনা শুনি…চিত্ত অগ্রসরি সমস্ত স্পর্শিতে চাহে…ইচ্ছা করে, আপনার করি

যেখানে যা কিছু আছে…নদীস্রোতোনীরে আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে নব নব লোকালয়ে করে যাই দান পিপাসার জল। গেয়ে যাই রচা গান দিবস-নিশীথে…ইচ্ছা করে, প্রাণ ঝড়ে ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণ পথে ভবে।

পড়তে পড়তে আমাদের কিশোর-চিত্ত পৃথিবীর মানচিত্র ধরে ভূপর্য্যটনে বেরুতো। এ যে শুধু কবি-চিত্তের ক্ষণেকের উচ্ছ্বাস নয়, তা সকলে জেনেছে পরে… অনেক বছর পরে।

এই সময়েই (১৯০২-০৩) পড়ি বিদায় অভিশাপ—কচ-দেবযানীর কাহিনী। মাইকেল মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক পড়েছিলুম আগে। তাঁর উপর অচলা ভক্তি…তাঁর লেখা খুব ভালো লাগতো। কচ-দেবযানীর গল্পটি মহাভারতে পড়া ছিল…কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'কচ-দেবযানী' পড়ে আমরা বিহ্বল হয়েছিলুম। নাট্য-কবিতাটি সুরু হয়েছে—গুরু শুক্রাচার্য্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখে স্বর্গে ফেরবার পূর্ব্বক্ষণে গুরু-কন্যা দেবযানীর কাছে বিদায় নেবার ক্ষণে। কচ বললেন—

> দেহো আজ্ঞা দেবযানী, দেবলোকে দাস
> করিবে প্রয়াণ। আজি গুরুগৃহবাস
> সমাপ্ত আমার।

উত্তরে দেবযানী বললেন—মনোরথ পুরিয়াছে * * * ? আর কিছু নাহি কি কামনা? ভেবে দেখো মনে মনে।

কচ বললেন—আর কিছুই নাই। দেবযানী তবু বলেন—কিছু নাই! তবু আরবার দেখো ভাবি!

দেবযানী মনে মনে ভালোবেসেছেন কচকে। তাঁর মনে বেদনা হলো। তিনি বললেন—

যেতেছ চলিয়া?
সকলি সমাপ্ত হলো দুকথা বলিয়া?
দশ শত বর্ষ পরে এই বিদায়?

কচ তবু বোঝেন না! তিনি যেজন্য এসেছিলেন, নিষ্ঠাভরে তাই পাবার সাধনা করেছেন···অন্য কোনোদিকে তাঁর মন ছিল না, লক্ষ্য ছিল না। কচ বললেন—দেবযানী, কী আমার অপরাধ?

দেবযানী বললেন—

হায়, সুন্দরী অরণ্যভূমি সহস্র বৎসর
দিয়েছে পল্লবছায়া পল্লব মর্ম্মর,
শুনায়েছে বিহঙ্গ-কূজন···তারে আজি
এতই সহজে ছেড়ে যাবে?

নিজের মনের কথা গোপন করে অরণ্যভূমির নানা দানের কথা তুললেন দেবযানী। কচ স্বীকার করলেন সে সব দান। দেবযানী তুললেন তখন প্রথম যেদিন কচ এসেছিলেন···তাঁর সঙ্গে সেদিনের প্রথম পরিচয়ের কথা··· দৈত্যদের ঈর্ষা থেকে কচকে দেবযানী রক্ষা করেছিলেন···সেই

বঁধু মনে করিয়ে দিলেন। শুনে কচ বললেন—সেই কথা হৃদয়ে জাগায়ে রবে চিরকৃতজ্ঞতা।

দেবযানী নিশ্বাস ফেললেন···বললেন—কৃতজ্ঞতা! ভুলে যেয়ো—কোনো দুঃখ নাই। উপকার যা করেছি হয়ে যাক ছাই!

দেবযানী নিজেকে সম্বরণ করতে পারলেন না···বললেন—কত দিন···যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছ যেমনি···যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি·· অমনি সর্ব্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া! সে কি আমি দেখি নাই? ধরা পড়িয়াছ বন্ধু, বন্দী তুমি তাই মোর কাছে। এ বন্ধন নারিবে কাটিতে··· ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে।

কচ বললেন—সহস্র বৎসর ধরি এ দৈত্যপুরীতে এরি লাগি করেছি সাধনা?

দেবযানী বললেন—কেন নহে? বিদ্যারি লাগিয়া শুধু লোকে দুঃখ সহে এ জগতে? করেনি কি রমণীর লাগি কোনো নর মহাতপ? * * * বিদ্যা একধারে, আমি একধারে—কভু মোরে, কভু তারে চেয়েছো সোৎসুকে। তব অনিশ্চিত মন দোঁহারেই করেছে আরাধন। * * * লহো সখা চিনে··· কারে চাও···

রমণীর মন সহস্র বর্ষেরি সখা,
সাধনার ধন!

কচ বললেন—দেব-সন্নিধানে পণ করে এসেছিলে/ন, মহাসঞ্জীবনী-বিদ্যা শিখে যাবেন···তিনি শুধু সেজন্য এখানে এসেছিলেন! বললেন, কোনো স্বার্থ জানি না···কামনা কিছুই নাই!

এ-কথায় দেবযানীর হলো রাগ। উপযাচিকা হয়ে তিনি মনের কথা বললেন···আর তাঁকে করেন কচ প্রত্যাখ্যান! কচ বুঝলেন দেবযানীর অভিমান এবং বেদনা। কিন্তু তিনি নিরুপায়। কচ বললেন—জ্ঞানে প্রতারণা করি নাই। বললেন, দেবযানীকে দেখে যদি আনন্দ-সন্তোষ পেয়ে থাকেন···তার শাস্তি দিতেছেন বিধি। তাঁর কোনো কথা কাকেও বলার কি প্রয়োজন? চিরতৃষা যদি জেগে থাকে সর্ব কার্য্য মাঝে···তবু চলে যেতে হবে। বললেন—এই সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রদান করলে তবে তাঁর জীবন হবে সার্থক···এ বিদ্যাপ্রদানের পূর্ব্বে নিজের সুখ বলে তাঁর কিছু নেই। কচ বললেন—ক্ষম মোরে···ক্ষম অপরাধ।

দেবযানী বললেন—ক্ষমা কোথা মনে মোর? করেছ এ নারী-চিত্ত কুলিশ কঠোর! তুমি চলে যাবে স্বর্গলোকে সগৌরবে···আপনার কর্ত্তব্যপুলকে সর্ব্ব দুঃখ-শোক করি দূরপরাহত···আমার কী আছে কাজ? কী আমার ব্রত? আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে কী রহিল? কিসের গৌরব? লুটাইল এ পথের ধূলিপরে সকল মহিমা। তোমা

'পরে এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে মোরে করো অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার সম্পূর্ণ হবে না বশ! তুমি শুধু তার ভারবাহী হয়ে রবে···করিবে না ভোগ, শিখাইবে··· পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

শান্ত কণ্ঠে কচ দিলেন জবাব—

আমি বর দিনু দেবী তুমি সুখী হবে
ভুলে যাবে সর্ব্ব গ্লানি বিপুল গৌরবে।

বিদায় অভিশাপ এতটুকু নাট্য-কাব্য···কিন্তু এতটুকু কাব্যে opic-এর যে মহিমা-গৌরব ফুটেছে···তার তুলনা মেলে না। পুরাণের কাহিনী অক্ষুণ্ণ রেখে···সে-কাহিনীকে আরো বেশী মহিমান্বিত করে তোলা···রবীন্দ্রনাথের তাতে কী অসাধারণ শক্তি···তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়—কর্ণকুন্তী সংবাদ, গান্ধারীর আবেদন প্রভৃতি কাব্যে। বিদায় অভিশাপে কচের ঐ বরদান···এর সঙ্গে পুরাণের কাহিনীর কি অপূর্ব্ব সঙ্গতি তিনি রক্ষা করেছেন। পরে দেবযানীর বিবাহ হয়েছিল সূর্য্যবংশের রাজা যযাতির সঙ্গে এবং দেবযানীর গৌরব মলিন হয় নি। কচের কণ্ঠে—ভুলে যাবে সর্ব্ব গ্লানি বিপুল গৌরবে—বরদানের এ দুটি ছত্র যেন হীরার মতো কাব্যটিকে দীপ্তি দিয়েছে!

চার

কত পাখী গায়, কত ফুল ফোটে—
জেগে ওঠে কত প্রাণ

পেলুম চিত্রায় 'উর্ব্বশী'। উর্ব্বশী কে? মাতা নন… কন্যা নন…বধূ নন—সুন্দরী রূপসী নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী। বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি…ফুটেছেন উর্ব্বশী! কবি তাঁকে বলছেন—

কোনোদিন ছিলে নাকি মুকুলিকা বালিকাবয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্ব্বশি!
যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যায় দান
স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী
অখিলমানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী
হে স্বপ্নসঙ্গিনি!

এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি জগতের আর কোনো কবি করেছেন কিনা জানি না! ইংরেজী বহু লিরিক পড়েছি…কিন্তু উর্ব্বশীর পাশে তার কোনোটি আসন পাবে না। এ-কথা তরুণ বয়সে মনে হয়েছিল…আজো সে-ধারণা তেমনি আছে!

সে সময়ে রবীন্দ্র-বিদ্বেষীর দল বলতেন—রবীন্দ্রনাথ কি লেখাপড়া করেছেন? তাঁদের বলতুম—পড়ো তাঁর লেখা 'মেঘদূত', পড়ো 'বিজয়িনী', পড়ো 'বৈষ্ণব কবিতা'··· তাঁর পড়ার এবং পড়ে মর্ম্ম উপলব্ধির পরিমাণ দেখে মুখে বাক্য সরবে না! তখনকার এম-এ, পি-আর-এস এর দলে অনেকের স্পর্দ্ধা যত ছিল···আসল জ্ঞান ছিল তার সিকির সিকি!

মনে আছে, তাঁকে অনেকে cocknoy-কবি বলে পরিহাস করতেন। তারা ইংরিজি ককনি কথাটা শিখে বিদ্যা জাহির করতে চাইতেন! রবীন্দ্রনাথের কবিতা হয় তাঁরা পড়তেন না···কিম্বা পড়ে তার অর্থ বুঝতেন না। কলেজের সহপাঠীরা তাঁর কবিতা নিয়ে এ-কথার প্রতিধ্বনি তুললে স্পষ্ট ভাষায় বলতুম—কবিতা বলতে যারা শুধু—'সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন···এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে···যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে'···এ-কবিতা যারা মানে মুখস্থ করে বোঝে, বুঝে ইস্কুলের পরীক্ষা দেয়···তাদের সাধ্য নেই, রবীন্দ্রনাথের কবিতার মর্ম্ম বোঝে! এমন বিদ্রূপের কি অন্ত ছিল···না, এমন বিদ্রূপ কোনো ছোট গণ্ডীর লোক করতো? অনেকে নিন্দা করতো হিংসাবশে···দু-চার বার এমন কথাও আমরা বলেছি···তর্কের ঝাঁজে। এমন কথা···পরে··· রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের ক' বছর আগেও কয়েকজনকে

ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতে দেখেছি এবং আজও দেখছি, তাঁদের মধ্যে দু-চারজন রবীন্দ্র-কাব্যের নামজাদা ব্যাখ্যাকার হয়েছেন···রবীন্দ্র-স্মৃতি-সভায় সভাপতিত্ব করতে উঠে গদগদ কণ্ঠে রবীন্দ্র-রচনাবলীর কণ্ঠে জয়মালা দিচ্ছেন! এ থেকে বোঝা যায়, স্বার্থপ্রণোদিত হয়েই অনেকে তাঁর নিন্দা করতো ···কিন্তু যাক, এ-কথা ধর্তব্যে আনা চলে না।

যা বলছিলুম! তাঁর 'সাধনা' কবিতাটি—

দেবি, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি···
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।
তুমি জানো মোর মনের বাসনা
যত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবস-নিশি···
মনে যাহা ছিল হয়ে গেল আর
গড়িতে ভাঙিয়া গেল বার বার···
ভালোয় মন্দে আলোয় আঁধার
গিয়েছে মিশি।
তবু ওগো দেবি, নিশিদিন করি পরাণপণ
চরণে দিতেছি আনি

কত পাখী গায়, কত ফুল ফোটে—জেগে ওঠে কত প্রাণ

তোমার জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন

ব্যর্থ সাধনখানি !

এ-কবিতায় যে determination, সাধনার নিষ্ঠার যে সুর জেগেছে…পড়ে নিরাশ চিত্তে আশা জাগে, শক্তি জাগে। আমরাও জীবনে বহুবার নৈরাশ্যের আঘাত পেয়ে এ-কবিতার দৌলতে ভেঙ্গে পড়িনি। কারো ভেঙ্গে পড়বার কথা নয়! এবং মনে আছে, এ-কবিতাটি কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে যখন আবৃত্তি করেছিলুম…তখন আমাদের ইংরেজীর প্রোফেশর বলেছিলেন—বাঃ…বাঙলায় এমন কবিতা আছে…চমৎকার! এ-কথায় হাসবো, কি কাঁদবো… বুঝিনি! ইনি কলেজের প্রোফেশর…ইংরেজীতে এম-এ… ফার্ষ্ট-ক্লাশ এম-এ…সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান এমন! আসলে, একমাত্র বঙ্গবাসী কলেজেব তদানীন্তন ইংরেজীর প্রোফেশর সুপ্রসিদ্ধ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলেজে টেনিশন, কীটস, শেলি, সেক্সপীয়ার পড়াবার সময় রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে parallel passages quote করতেন। শুধু quote করা নয়…বুঝিয়ে দিতেন, তাঁদের লেখা বহু বিখ্যাত কাব্যের চেয়েও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কথা অনেক উঁচু দরের এবং বলবার ভঙ্গী প্রায় তুলনাবিহীন! আমরা বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপক ললিতকুমারের ছাত্র ছিলুম না কোনোদিন…কিন্তু সেখানে আমাদের যে-সব বন্ধু পড়তেন, তাঁদের মুখে এ-কথা

শুনে প্রোফেশর ললিতকুমারের ক্লাশে গিয়ে বসে তাঁর লেকচার শুনতুম এবং পরে যখন ভারতী পত্রিকার সম্পাদনা করি (১৩২২-১৩৩০)…তখন তাঁর সঙ্গে হয়েছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং চোরাইভাবে তাঁর ক্লাশে গিয়ে তাঁর লেকচার শোনার কাহিনী বলেছিলুম। আজ কোনো প্রোফেশর এমন কাজ করলে তাতে বিস্মিত হবার কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু সে-যুগে…অর্থাৎ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে এ-কথা খুবই বিস্ময়ের ছিল, নিশ্চয় !

১৮৯৯ সালে…তখন ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ি…কলেজে হলো বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয়। নাটকখানিতে গুণবতী চরিত্র এবং অপর্ণার চরিত্র কেটে বাদ দিয়ে অপর্ণার উক্তি প্রভৃতি বালক ধ্রুবর মুখে বসিয়ে দিয়েছিলেন কলেজের এক প্রোফেশর। ইনি ছিলেন অভিনয়ের চার্জে। স্কুল-কলেজের ছেলেরা মেয়ে সাজবে কি…রুচি-বিকার ঘটে যদি ! স্ত্রী-চরিত্র-বর্জ্জিত সে-নাটকে আমি নেমেছিলুম নক্ষত্র রায়ের ভূমিকা নিয়ে। ইচ্ছা ছিল, জয়সিংহ সাজবো…কিন্তু জয়সিংহ যিনি সেজে-ছিলেন, তাঁর ছিল মুরুব্বির জোর। তিনি ছিলেন কলেজের এক প্রোফেশরের ভ্রাতুষ্পুত্র—কাজেই ও-ভূমিকা আমি পাইনি ! সে-অভিনয় দেখে কজন প্রোফেশর বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন—খাশা নাটক তো ! রবীন্দ্রনাথ তাহলে শুধু কবিতা লেখেন না…নাটকও লেখেন !

এ-কথা বললুম···শুধু তখনকার দিনে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ রবীন্দ্রনাথকে কতটুকু জানতো, মানতো—বোঝাবার জন্য !

এ না-জানার প্রধান কারণ ছিল—তখন বাঙলা ভাষা এবং বাঙলা সাহিত্য ছিল recognition-এর বহির্ভূত। নানা স্বার্থে মানুষ শুধু ইংরেজী ভাষা আর সাহিত্য নিয়ে তন্ময় ছিল। বাঙলা-সাহিত্যের কি প্রয়োজন?—এই ছিল পঞ্চাশ বছর আগেকার তথাকথিত বাঙালী সমাজের মনোভাব ! বাঙলা ভাষা এবং বাঙলা সাহিত্য পাঙক্তেয় হয়েছে—আমাদের মনে হয়, এই সেদিন এবং তা হয়েছে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কৃপায়। বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন··· এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বাঙলা ভাষা এবং বাঙলা সাহিত্যকে এখনকার এ-মর্য্যাদার আসনে বসাতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তখনকার পণ্ডিতদের মতে শুধু উপন্যাস-লেখক···খাশা গল্প-লেখক। তিনি সে-সব উপন্যাস লিখে এবং তাঁর বঙ্গদর্শন মাসিক বার করে বাঙলা দেশের এবং বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ রচনা করেছেন কিভাবে··· সেদিকে কজনের-বা হুঁশ-খেয়াল ছিল ! মাইকেল···তিনি মেঘনাদ বধ লিখেছেন বেশ জোরালো ভাষায়—এইটুকু ছিল তাঁর গুণের পরিচয়। হেমচন্দ্রের নাম সকলে করতো··· তিনি 'বাজরে শিঙা' কবিতা লিখেছেন—সেই জন্য ! ক'জন পড়তো তাঁর কবিতা ?

এমন দিনে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সাহিত্য-ক্ষেত্রে··· তখনো সমঝদাররা সেক্ষেত্রে এসে পৌঁছুতে পারেন নি! যদি বলি, আমাদের আমোল থেকেই রবীন্দ্র রচনাবলীর গুণগ্রাহীর সৃষ্টি হলো···তাহলে ঐতিহাসিক হিসাবে সে-কথা অত্যুক্তি হবে না। কলেজে দ্বিতীয়-তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় আমিও তো রবীন্দ্রনাথের দুই বিঘা জমি, পুরাতন ভৃত্য প্রভৃতি কবিতার আবৃত্তি করেছি, তখন সে-কবিতা শুনে তখনকার দিনের বহু কৃতবিদ্য মহাজনখ্যাত ব্যক্তিরা কবিতা-গুলির রচনার খুব তারিফ করেছিলেন এবং আমরা ক্ষুদ্র সাধ্য-অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের কবিতাদির প্রচার-কার্য্যে কখনো বিরাম দিই নি। এ-কথায় কেউ মনে করবেন না, রবীন্দ্রনাথের রচনার মর্ম্ম উপলব্ধি করবার মতো মানুষ তখন একেবারে ছিলেন না! ছিলেন; তবে তাঁদের সংখ্যা খুব অল্প ছিল—শতকরা বড় জোর দশ-বারো জন মাত্র!

'চিত্রা'র ১৪০০ সাল কবিতাটি—একশো বছর পরে যে সব পাঠক-পাঠিকা পড়বেন তাঁর কবিতা···তাঁদের উদ্দেশ করে কবি লিখেছেন—

আজি হতে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে
আজি হতে শত বর্ষ পরে!

কত পাখী গায়, কত ফুল ফোটে—জেগে ওঠে কত প্রাণ

আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের

লেশমাত্র ভাগ

আজিকার কোনো ফুল বিহঙ্গের কোনো গান

আজিকার কোনো রক্তরাগ

অনুরাগে সিক্ত করি পারিব কি পাঠাইতে

তোমাদের করে

আজি হতে শত বর্ষ পরে!

*　　　*　　　*

আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত দিনে

ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে—

হৃদয়-স্পন্দনে তব　　　ভ্রমর-গুঞ্জনে নব

পল্লব-মর্ম্মরে

আজি হতে শত বর্ষ পরে!

কল্পনার প্রসার দেখে চমৎকৃত হতে হয়! এ-কবিতা শুধু অন্তরে উপলব্ধি করবার—এর ব্যাখ্যা বুঝতে হয় যাকে··· কবিতা পড়া তার উচিত নয়! যাঁরা বলতেন, রবীন্দ্রনাথ শহুরে-কবি · তাঁরা হয়তো পল্লীগ্রাম দেখেছেন! পল্লীগ্রামের কি দেখেছেন···তাঁরাই জানেন! কিন্তু পল্লীতে রবীন্দ্রনাথ যা দেখতেন···এ-সব পণ্ডিত নিশ্চয় তা দেখেন নি বা এ-সব দেখবার মতো চোখের দৃষ্টি থেকে তাঁরা বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' কবিতাটির কথা বলি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমী মজুর। তাহাদেরি ছোট মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা—কত ঘষামাজা
ঘটি বাটি থালা লয়ে কত ব্যস্ত! দিদি সে—
তারি ছোটো ভাই—নেড়া মাথা কাদামাথা গায়ে বস্ত্র নাই—
পোষা পাখীটির মতো কাছে কাছে ফিরে
বসি থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে—
* * * জননীর প্রতিনিধি
কর্ম্মভারে অবনত—অতি ছোটো দিদি।

কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা—১৯০১ সালে বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উদ্যোগে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার নব-পর্য্যায় প্রকাশিত হলো। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'—সে ছিল অত্যন্ত sacred—আমাদের কাছেই নয় শুধু···বাঙালী জাতির শ্রদ্ধার, পূজার সামগ্রীর মতো। বঙ্গদর্শন বেরুবে—তার সম্পাদক হবেন কে? তখনো বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক প্রখ্যাত কজন সাহিত্যরথী বেঁচে আছেন—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সকলেই বললেন—রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ও-আসন আর কারো হতে পারে না। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চল্লিশ বৎসর। বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন শাণিত প্রবন্ধ—দক্ষিণ আফিকায় ব্রিটিশ ইম্পীরিয়ালিজমের বর্বর নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ

তখন সেখানকার বুয়ার জাতির সঙ্গে লড়াই সুরু করেছে। এই সময়েই তিনি লিখলেন তাঁর 'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলি। এই সময়েই কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ধ হয়ে কাশীতে বাস করছিলেন…অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে; রবীন্দ্রনাথ উদ্যোগী হয়ে তাঁর সাহায্যকল্পে নিজে টাকা দিয়েছিলেন এবং দেশের জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়ে অনেক টাকা সংগ্রহ করে হেমচন্দ্রের কষ্ট-লাঘবের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছিলেন। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁর 'কণিকা', 'কথা', 'কাহিনী', 'ক্ষণিকা' প্রকাশিত হয়েছিল। এক-একখানি কাব্যগ্রন্থ বেরুতো…সেগুলিতে আমাদের প্রাণের প্রসার বাড়তো কত…বলে বোঝাতে পারবো না। তাঁর রচনার জন্য আমরা আশাপথ চেয়ে থাকতুম। এখনকার দিনে তরুণের দল দেখি, সিনেমার নতুন ছবির জন্য অধীর উন্মুখ থাকেন…সিনেমা ছাড়া তাঁদের অনেকের অন্য কোনো দিকে মন যায় না—আমাদের মন তেমনি উন্মুখ উদগ্র থাকতো রবীন্দ্রনাথের কি নতুন লেখা পাবো…কবে পাবো—তার প্রত্যাশায়।

বঙ্গদর্শনে 'চোখের বালি' উপন্যাস ধারাবাহিক বেরুতে লাগলো। রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগীদের আনন্দের সে কি চাঞ্চল্য! রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণীর গুণে মহেন্দ্র, আশা, বেহারী, বিনোদিনীকে শুধু জীবন্ত দেখলুম না…তাদের দেখলুম, যেন

কত চেনা, কত জানা! আমাদের পাশাপাশি তাদের বাস! বইয়ের পাতার নির্জীব জীব আদর্শ-উপদেশের পুতুল বলে তাদের কাকেও মনে হয় নি। উপন্যাসের প্রত্যেকটি সিচুয়েশন কতখানি স্বাভাবিক…মনে হতো, এমন ঘটনা আপনার-আমার জীবনে ঘটতে পারে…ঘটা বিচিত্র নয়! উপন্যাস-সাহিত্যে চোখের বালি নূতন পথ দেখিয়ে দিয়েছিল এবং এই পথে চলেই রবীন্দ্রনাথের পর কত লেখক কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছেন। আধুনিক কথা-সাহিত্যের ধারা—এ-ধারার প্রবর্ত্তন করে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ!

বঙ্গদর্শনেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য কালচার নিয়ে বহু আলোচনা করে হিন্দু-কালচারের প্রকৃত মর্ম্ম ঐতিহাসিক ভাবেই বুঝিয়েছিলেন।

১৯০১ সালেই বৈষয়িক সকল কাজ ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে এসে বাস করেন সপরিবারে এবং ১৯০১ সালের ৭ই পৌষ তারিখে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন যুগের আদর্শে অধ্যাপনার প্রবর্ত্তনা…তাঁর এক বিপুল কীর্ত্তি। খোলা মাঠে তরুতলে বসে পাঠ…গল্পে-গাথায় শিক্ষাদান…খেলাধূলা… নাচ-গান-বাজনা…নানা শিল্পচর্চ্চা—এইগুলি ছিল শিক্ষাদানের অঙ্গ। তিনি নিজে নিলেন আচার্য্যের আসন এবং তাঁর সঙ্গে প্রথমে সহযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন জগদানন্দ রায়,

ইংরেজ লরেন্স, শিল্পী রেওয়াচাঁদ (পরে স্বামী অনিমানন্দ) এবং পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব। এত বড় কাজে তিনি নামলেন… কিন্তু এ-কাজ চালাবার অনুরূপ অর্থবলের অভাব। এর পূর্ব্বে ব্যবসা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন… পৈতৃক আয় থেকে বহু টাকা যেতো সে-ঋণ শোধ করতে। এই ব্যবসার সম্বন্ধেই তিনি কবিতা লিখেছিলেন (কড়ি ও কোমলে এ-কবিতা আছে)—

আকাশ জুড়ে জাল ফেলে
তারা ধরার ব্যবসা।
থাকগে তোমার পাটের হাটে
মথুর কুণ্ডু শিবু সা।

এই মথুর কুণ্ডু এবং শিবু সা ছিলেন তাঁদের জমিদারী কুমারখালিতে পাটের বড় আড়তদার। পাটের ব্যবসা চালাতে রবীন্দ্রনাথ বহু টাকা ধার করেছিলেন—সে-ঋণের কোনো দলিল ছিল না। মহাজন বেণী সাহা একবার তাগাদায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—টাকাটা তামাদি হয়ে যাবে হুজুর কমাস বাদে। এ-কথার জবাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—ভদ্রলোক যে-টাকা ধার করেন, সে-টাকা কখনো তামাদি হতে পারে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

এবং তামাদি হবার কদিন পূর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথ বেণী সাহার এ-ঋণ কড়াক্রান্তিতে শোধ করে দিয়েছিলেন।

এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিবেচনা কত প্রখর ছিল··· ১৯১৫-১৬ সালে (আমার জীবনে) আমি তার অপূর্ব্ব প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলুম। সে-কথা পরে বলবো।

রবীন্দ্রনাথের নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন—বাঙলার মাসিক-সাহিত্যেই শুধু নয়···বাঙলা সাহিত্যে কি সম্পদ দান করে গিয়েছে, তার পরিমাপ কষবেন ঐতিহাসিক···তার আলোচনায় আমি কোনো কথা বলবো না। .

আমি আর এক কাহিনী বলছি···যে-কথা অনেকে হয়তো জানেন না।

মাসিকপত্র বেরুলেই বহু ব্যক্তির লেখার সখ জাগে এবং অনেকে তাঁদের লেখা মাসিকে ছাপাবার জন্য পাঠান। এ-রীতি আজো আছে। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ···তাঁর নীচে ছিলেন সহকারী সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র। এঁর একটি বইয়ের দোকানও ছিল—বই বিক্রয় করা শুধু নয়···বাঙলা গল্প উপন্যাস কবিতা গ্রন্থ এঁরা প্রকাশ করতেন—সে পুস্তকালয়ের নাম ছিল মজুমদার লাইব্রেরী। শিবনারায়ণ দাসের গলির মুখে ঠিক দক্ষিণ দিকের বড় বাড়ীর দক্ষিণ দিকের বড় ঘর—সেই ঘরে ছিল মজুমদার লাইব্রেরী এবং বঙ্গদর্শনের কার্য্যালয়। এই মজুমদার লাইব্রেরী থেকেই অধ্যাপক মোহিতচন্দ্রের সম্পাদনায় 'ক' খণ্ডে সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্গদর্শনের ললাটপটে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের নামের নীচে ছাপা হতো—সহ-সম্পাদক শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

রবীন্দ্রনাথ হেসে বলতেন—দুঃসহ সম্পাদক!

বঙ্গদর্শনে ছাপাবার জন্য বহু গল্প-প্রবন্ধ-কবিতাদি আসতো। শৈলেশচন্দ্র প্রথমে সেগুলি পড়ে শ্রেণী-বিভাগ করতেন—প্রথম শ্রেণীর রচনা, দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা, তৃতীয় শ্রেণীর রচনা, প্রকাশের অযোগ্য···এমনি মন্তব্য করে; এবং রবীন্দ্রনাথকে দিতেন প্রথম শ্রেণীর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখাগুলি। তা থেকে রবীন্দ্রনাথ বেছে নিতেন বঙ্গদর্শনে যে-সব লেখা ছাপাবার যোগ্য, সেগুলি; তার পরের ক্লাশের লেখার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলতেন—বঙ্গদর্শনে না চললেও এমনিতে চলনসই।

এমনিতে চলনসই লেখাগুলি শৈলেশচন্দ্র ছাড়তে পারতেন না। সেগুলি নিয়ে তিনি বার করতে লাগলেন ডবল ক্রাউন সাইজে চার ফর্ম্মার একখানি মাসিকপত্র—তার নাম ছিল 'সমালোচনী'। সমালোচনী তখন জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল। এ-যুগের অনেকে হয়তো জানেন না, শৈলেশচন্দ্র রস-রচনায় বেশ পটু ছিলেন। তাঁর লেখা 'ইন্দু' ছোট নভেল এবং কতকগুলি টাইপ-চরিত্রকে কেন্দ্র করে কটি ছোট গল্প 'চিত্র-বিচিত্র' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। 'চিত্র বিচিত্র' রবীন্দ্রনাথের কাছে অনেকখানি সুখ্যাতি লাভ

করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা ত্যাগ করলে শৈলেশচন্দ্র ক বছর করেছিলেন বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা এবং তাঁর সম্পাদনা-কালে শৈলেশচন্দ্র লিখেছিলেন বঙ্গদর্শনে একখানি উপন্যাস—নীলকণ্ঠ। উপন্যাসখানি ভালোই… স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে নীলকণ্ঠ বেরিয়েছিল কি-না জানি না।

যখন বঙ্গদর্শন এবং সমালোচনী মাসে মাসে প্রকাশিত হচ্ছে…তখন (১৯০৩) আমি জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে ফোর্থ ইয়ার ক্লাশে পড়ি…কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্র-সাহিত্যদর্শী অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন আমার সহপাঠী। সত্যেন্দ্র-নাথ, অজিতকুমার এবং আমি…আমাদের…তিনজনের থার্ড সাবজেক্ট ছিল সংস্কৃত। সংস্কৃতের ক্লাশে ছাত্র-সংখ্যা কম। সে ক্লাশে তিনজনে খুব অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। স্কুলে পড়বার সময় থেকে আমি যে কবিতা লিখতুম, সুরেন্দ্রনাথ শুধু জানতেন। সে-সব কবিতা লাইন-টানা বাঁধানো খাতায় আমি সযত্নে কপি করে রাখতুম…সুরেন্দ্রনাথ চেয়ে নিয়ে পড়তেন। তিনিও লিখতেন কবিতা, ছোট গল্প…তাঁর লেখা কবিতা, গল্প তিনি আমাকে পড়তে দিতেন। একদিন সত্যেন্দ্রনাথ এবং অজিত-কুমারকে সুরেন্দ্রনাথ বলেন আমার কবিতা লেখার কথা। তাঁরা পড়তে চাইলেন…সঙ্কোচভরে দিলুম তাঁদের আমার কবিতার খাতা। পাঁচ-সাতদিন পরে খাতা ফেরত পেলুম। সত্যেন্দ্র

এবং অজিত হেসে তখন বলেছিলেন—আপনাকে বেশ একটু surprise দেবো! আমি প্রশ্ন করলুম—কি রকম? সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—এখন এর বেশী বলবো না··· বাকিটুকু ক্রমশঃ-প্রকাশ্য!

আমার মনে অস্বস্তি জেগে রইলো এবং তার এক মাস পরে অজিতকুমার ক্লাশে এসে আমার হাতে এক কাপি সমালোচনী দিলেন···দিয়ে বললেন—এতে আপনার কবিতা ছাপা হয়েছে।

আমার বিস্ময়ের সীমা নেই! বই খুলে দেখি, আমার লেখা 'পূর্ণিমা রাত্রে' সনেট সমালোচনীতে ছাপা হয়েছে।

হেসে সত্যেন্দ্রনাথ এবং অজিতকুমার বললেন—কবিতার খাতাখানি শৈলেশবাবুকে দেখিয়েছিলুম। তিনি পড়ে ঐ কবিতাটি পছন্দ করেন। রবীন্দ্রনাথকে দেখাতে তিনি বললেন, বঙ্গদর্শনে ছাপবার মতো নয়···তবে কবিতা ভালো···সমালোচনীতে ছাপো।

তার পর অবশ্য ঐ বছরেই কুন্তলীন গল্প প্রতিযোগিতায় আমার লেখা 'শাস্তি' গল্প পায় প্রথম পুরস্কার এবং ১৯০৪ সালে বি-এ পাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ সমাজপতি নিজে এসে আমার কটি গল্প পড়ে পর-পর সাহিত্য পত্রে সেগুলি ছাপিয়েছিলেন।

বি-এ পাশ করবার পরে সত্যেন্দ্রনাথ এবং অজিতকুমারের দর্শন পাইনি বহুকাল ; পরে যখন আবার তাঁদের পেলুম, তখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি একটু চলতে আরম্ভ করেছি।

ফোর্থ ইয়ারে পড়বার সময় সত্যেন্দ্রনাথ এবং অজিত-কুমারের সঙ্গে কথা যা হতো, তা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর রচনা—এই ছিল আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। তাঁদের মধ্যে অজিতকুমার প্রায় যেতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। সত্যেন্দ্রনাথ চিরদিন ছিলেন shy··· তিনি ক্বচিৎ কখনো যেতেন···গেলেও চুপচাপ বসে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে খুব স্নেহ করতেন···পরিচয় পেয়েছিলেন, অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পৌত্র। অক্ষয়কুমার ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহচর এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক। অজিতকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন সতীশচন্দ্র রায়। তরুণ বয়সেই তাঁর রচনা-শক্তির পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, প্রতিভাধর।

তরুণ বয়সেই সতীশচন্দ্র যে-সব কবিতা—fantasy এবং সাহিত্য-সন্দর্ভ লিখে গিয়েছেন···সেগুলি বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ। তাঁর লেখা 'রাজকন্যা' অপূর্ব্ব fantasy···বাঙলা সাহিত্যে সে লেখার জুড়ি আজ পর্য্যন্ত দেখিনি! রূপকথার রাজকন্যা কত রূপে কত বেশে যুগ-যুগান্তর ধরে নর-নারীর চিত্তে যে fascination জাগিয়ে আসছেন···তারি

কাব্যময় কাহিনী রূপকের ছাঁদে করে লেখা—ভাষা যেমন সাবলীল …তেমনি কবিত্বময়! সতীশচন্দ্র তরুণ বয়সেই বোলপুর আশ্রমে শিক্ষকতার ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯০৪ সালে ১লা ফেব্রুয়ারি বোলপুরে দুরন্ত বসন্ত রোগে সতীশচন্দ্রের জীবনান্ত ঘটে। তখন রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা ১৯০৩ সালে পরলোকগমন করেন। তার ছমাস পূর্ব্বে ১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথের পত্নী মৃণালিনী দেবী পরলোকগমন করেন। কবির জীবনে কি দুর্দিনের উদয় তখন! মাতৃহীন শিশুদের ভোলাবার জন্য তখন 'শিশু'র কবিতাগুলির সৃষ্টি এবং বঙ্গদর্শনে তখন চলেছে তাঁর নৌকাডুবি উপন্যাস। পত্নীবিয়োগে তাঁর লেখা কবিতাগুলি 'স্মরণ' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করে ছাপা হলো। টেনিশনের In Memoriam…শেলি এবং মিলটনের প্রিয়-বিয়োগ-বেদনাতুর কাব্যও পড়েছি, কিন্তু স্মরণের কবিতাগুলি—

ভালো তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধরা
তোমার হাসিটি ছিল বড়ো সুখে ভরা।
মিলি নিখিলের স্রোতে জেনেছিলে খুশী হতে
হৃদয়টি ছিল তাই হৃদিপ্রাণভরা।
তোমার আপন ছিল এই শ্যাম ধরা।

* * *

তোমার সে ভালো লাগা মোর চোখে আঁকি
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি।

আজি আমি একা-একা দেখি দুজনের দেখা
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি!

(২)

আজিকে তুমি ঘুমাও
আমি জাগিয়া রব দুয়ারে
রাখিব জ্বালিয়া আলো।

* * *

আমার লাগি তোমারে আর
হবে না হতে কালো!

এত শোক-তাপ···তার মধ্যেও বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কথা রবীন্দ্রনাথের মনে জেগে আছে সর্ব্বক্ষণ! টাকা চাই··· টাকা···আশ্রমের জন্য।

১৯০৩ সালে তিনি লিখলেন 'কর্ম্মফল'···নাট্যোপন্যাস। ছোট বই···পরে এই 'কর্ম্মফল' তিনি পুনর্লিখিত করেন —শোধবোধ নামে সেটি প্রকাশিত হয়! কুন্তলীনের এইচ্ বোস···হেমেন্দ্রমোহন বসুকে এ-গ্রন্থখানি তিনি বিক্রয় করেন তিনশো টাকা মূল্যে। হেমেন্দ্রবাবু এখানি তাঁর কুন্তলীন প্রেসে মনোজ্ঞভাবে ছেপে বিক্রয় করেন—বইয়ের দাম ছিল আট আনা।

১৯০৪ সালে বি-এ পাশ করবার পর আমাদের যে সমিতি ছিল···সেই সমিতির কাজে আমরা খুব উদ্যোগী

হয়েছিলুম। আশ্বিন মাসে সমিতির বার্ষিক উৎসব হতো; ১লা বৈশাখ তারিখে ব্যবসায়ীরা হালখাতা করেন…তাঁরা করেন ও-তারিখে উৎসব। আমরা স্থির করলুম, ১লা বৈশাখে বাঙলা নববর্ষোৎসব করবো। সেই ব্যবস্থা হলো—গান, প্রবন্ধ-পাঠ, আবৃত্তি এবং শেষে সকলকে light refreshment পরিবেষণ। রিফ্রেশমেণ্টের আয়োজনে ডালমুট ভাজা, নিমকি, কচুরি, বালুসাই, গজা এবং সন্দেশ পরিবেষণ করা হতো। মাটির প্লেটে সব সাজিয়ে রাখা হতো এবং সভার কাজ শেষ হলে গণ্যমান্যদের খাওয়ানো। প্রায় ষাট-সত্তর জনের মতো আয়োজন থাকতো। পানীয়ের মধ্যে ছিল জল আর সরবৎ! স্কুলের হলে অধিবেশন হতো। স্কুলের ফটক সাজানো হতো দেবদারু পাতা দিয়ে, মঙ্গল কলস রেখে এবং একদল শানাই-বাজিয়ে আনা হতো।

১৯০৫ সালের বৈশাখে সভাপতি করে এনেছিলুম সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। পূর্ব্বে তাঁর কবিতা-আবৃত্তি শুনেছিলুম। অপূর্ব্ব আবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথের কবিতাই তিনি আবৃত্তি করতেন। আমি শুনেছিলুম তাঁর আবৃত্তি—পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে। তিনি সভাপতি হয়ে আসছেন—তাঁকে শোনাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কবিতা 'দেবতার গ্রাস' মুখস্থ করে সেটি আবৃত্তি করেছিলুম। শুনে সত্যেন্দ্রনাথ

খুশী হয়ে আমাকে বলেন একটা রবিবারে বৈকালে তাঁর বাড়ীতে যেতে—চা-জলখাবারের নিমন্ত্রণ। তিনি তখন থাকতেন ষ্টোর রোডে—এখন যে বিরাট গৃহ বিড়লা মহোদয়দের আরাম-নীড়···ঐ বাড়ীতে। তখনো ছিল প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড···তবে এখনকার মতো বাড়ী শ্রী হারিয়ে তুঙ্গ দেহ ধরেনি—তখন ছিল নয়ন-মনের তৃপ্তিকর। সেই ষ্টোর রোডের এখন নূতন নাম হয়েছে গুরুসদয় দত্ত রোড।

তাঁর এ-নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলুম। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, ইন্দিরা দেবী এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। সত্যেন্দ্রনাথের কথায় তাঁদের শোনাতে হয়েছিল 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটি আবৃত্তি করে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো সরল, অমায়িক, স্নেহশীল ব্যক্তি খুব অল্প দেখেছি। তিনি আমাকে বলেছিলেন—মাঝে মাঝে তাঁর ওখানে আসবার জন্য। তাঁর নিত্য কাজ ছিল···রিকশয় চড়ে সকালে বৈকালে বাড়ীর সামনে বালিগঞ্জে যে প্রকাণ্ড ময়দান···ঐ ময়দানে বেড়ানো। রিকশখানি অবশ্য বাড়ীর··· সম্পূর্ণ নিজস্ব। ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে এমনিভাবে হয়েছিল আমার প্রথম সংযোগ।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গ···১৯০৫ সালের ১৬ই অগষ্ট···বাঙলা ১৩১২ সালের ৩০ আশ্বিন।

বাঙলার সে কি বিরাট জাগরণ সেদিন! সরকারী বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশশুদ্ধলোক অখণ্ড বাঙলা এবং বাঙালী জাতি অখণ্ড—এ-ঘোষণা প্রচার করেন। সারা বাঙলা দেশ জুড়ে কি বিরাট আন্দোলন চলেছিল! রাজনীতিক ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সর্ব্ববাদী-শিরোধার্য্য নেতা। স্থির হলো, সেদিন বাঙলা দেশ জুড়ে পালন করা হবে হরতাল···অরন্ধন; কোনো বাঙালীর বাড়ী সারাদিন উনুন জ্বলবে না। রোগী-আতুর-বৃদ্ধ ভিন্ন কেহ সেদিন রাঁধা ভাত-তরকারী খাবেন না···অগ্নি-স্পর্শ-করা কোনো খাদ্য গ্রহণ করবেন না। সকালে গঙ্গাস্নান···তারপর ভাই ভাই বলে ধনী-দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে হাতে হাতে রাখী বাঁধা এবং বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের পণ গ্রহণ।

এ-ব্যাপারে কবি রবীন্দ্রনাথ অগ্রবর্ত্তী হয়ে এসে দাঁড়ালেন ···তিনি লিখলেন রাখী-বন্ধনের গান—

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙলার ঘর বাঙলার মাঠ
বাঙলার বন বাঙলার হাট
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান!

রবীন্দ্র-স্মৃতি

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান!

রবীন্দ্রনাথ শুধু গান লিখেই ক্ষান্ত ছিলেন না। সকালে উঠে নগ্নপায়ে শুধু একখানি চাদর গায়ে দিয়ে সদলে এ-গান গাইতে গাইতে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে স্নান করেছিলেন···স্নান করে পথের দুধারে মুটে-মজুর দীন-দুঃখী ভিক্ষুক সকলকে বুক দিয়ে আলিঙ্গন করে ভাই বলে সকলের হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ীর কাছে বস্তীর ঘরে হাড়ি ডোম মুসলমান যারা ছিল···তাদেরো বুক দিয়ে বুকে নিয়ে ভাই বলে হাতে হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে দেখেছি···দেখে নিজেকে ধন্য বোধ করেছি! সেদিন ক্ষুধা-পিপাসা ছিল না···সারা শহর টহল দিয়ে বেড়িয়েছি। তার পর বৈকালে বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ীর প্রকাণ্ড কমপাউণ্ডে ধনভাণ্ডারে চাঁদা দেওয়া। এ ধন সংগ্রহ করে

কোনো জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যবস্থা ছিল—Federation Hall স্থাপনার সঙ্কল্প। সারা শহরের পথে যে লোকারণ্য দেখেছিলুম···তেমন লোকারণ্য কচিৎ দেখা যায়···সে-যুগে দেখা যায় নি।

রাখী-বন্ধনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কর্ত্তব্য শেষ হয়নি। তিনি যখন বালক, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশে নবগোপাল মিত্র করেছিলেন হিন্দু মেলার প্রবর্ত্তন। সকলকে স্বাবলম্বী করে তোলা ছিল এ-মেলার উদ্দেশ্য। নবগোপাল মিত্রের সঙ্গে সেকাজে যোগ দিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর; এবং দেশী ব্যবসার পত্তন করেছিলেন—দেশী ষ্টীমার কোম্পানি খুলেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

মহর্ষির আদর্শ-অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ স্বাবলম্বী হবার জন্য যে পদ্ধতি প্রস্তাব করেছিলেন, সে-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য এবং সদ্ভাব সংবর্দ্ধন, দেশের এবং সমাজের পক্ষে যা অহিতকর; এমন সব বিষয় নির্দ্ধারণ করে সে সবের প্রতিকার, গ্রামের যত বিরোধ-বিবাদ মেটাবার জন্য সালিশী মীমাংসা; স্বদেশী শিল্পের প্রচলন···সে-শিল্প সুলভ এবং সহজপ্রাপ্য করা চাই; প্রত্যেক জায়গায় যে-সব শিল্প আছে···সে সবের উন্নতিসাধন; পল্লী-সমাজের অধীনে যোগ্য শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয় স্থাপনা··· আবশ্যকমত নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার

ব্যবস্থা ; বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং মহাপুরুষদের জীবনীর সঙ্গে সাধারণের পরিচয় সাধন ; সুনীতি, ধর্ম্মভাব, একতা, স্বদেশানুরাগ সম্বন্ধে সকলকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ; প্রতি পল্লীতে একজন করে চিকিৎসক এবং ঔষধালয় স্থাপন ; অনাথ অসহায় ব্যক্তিরা যাতে ঔষধপথ্য পান···তাঁদের যাতে সুচিকিৎসা হয়···সে-ব্যবস্থা করা ; পানীয় জল, নদী-নালা, পথ-ঘাট, সৎকার-স্থান, ব্যায়ামাগার এবং ক্রীড়াক্ষেত্রাদির সুব্যবস্থা ; স্বাস্থ্যের উন্নতি যাতে হয়···সে চেষ্টা ; আদর্শ কৃষিক্ষেত্র এবং খামার স্থাপন ; স্থানীয় যুবকেরা করবেন চাষ-বাসের কাজ···গোমহিষাদি পালন—এ-সব কাজে জীবিকার্জ্জনের যেন সুবিধা হয়···দুর্ভিক্ষ না ঘটে—সে জন্য ধর্ম্মগোলা স্থাপন। গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরা কোনো না কোনো শিল্প কাজ করবেন···সে জিনিষ বেচে যে পয়সা পাওয়া যাবে, তাতে সংসারের অস্বচ্ছলতা কতক ঘুচবে। সুরা এবং সর্ব্ববিধ ব্যসন ত্যাগ করা চাই। এই সঙ্গে পল্লীর তত্ত্ব সংগ্রহ করতে হবে—কোথায় কত লোক···কি তাদের কাজ···সে কাজে উদরান্ন সংস্থানে অসুবিধা ঘটে কি না···কোথায় কত বিদ্যালয় আছে···কত ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখছে—এ-সব সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। জেলায় মানুষজনের মধ্যে যাতে সদ্ভাব হয় এবং সে-সদ্ভাব রক্ষা পায়···তা করা চাই।

কত পাখী গায়, কত ফুল ফোটে—জেগে ওঠে কত প্রাণ

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে যে অসহযোগ আন্দোলন চললো···তাতে রবীন্দ্রনাথ যে গানগুলি লিখেছিলেন···তারো তুলনা নেই!

তিনি লিখেছিলেন—

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ—
দুই নয়নে স্নেহের হাসি—
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ!

এ-আন্দোলনে ব্রিটিশ-শাসক যখন শাসনের কড়াক্কড় চালালেন, তখন রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
ততই বাঁধন টুটবে
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে
ততই মোদের আঁখি ফুটবে!

এ-আন্দোলনের বহু বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল কলকাতার টাউন হলে; রবীন্দ্রনাথ তখন বয়সে কিশোর···সে-অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা গান গেয়েছিলেন—

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে!

তাঁর এ-বাণী—আজ মনে হয়, যেন দৈববাণী! এ-বাণী কি করে সার্থক হয়েছে ক্রমে ক্রমে…সে ইতিহাস সত্যই অনুশীলনযোগ্য।

বহুকাল পূর্ব্বে—গল্প শুনেছি স্বর্ণকুমারী দেবীর কাছে… রবীন্দ্রনাথকে এক আসরে গান গাইতে বলা হয়েছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথ…যাঁরা গান শুনতে চেয়েছিলেন…তাঁরা সে-যুগের কংগ্রেসের পাণ্ডা। এ-আসর বসেছিল কংগ্রেসের ঐ দ্বিতীয় অধিবেশনের পরে। রবীন্দ্রনাথ তখন গেয়েছিলেন—

আমায় বলো না গাহিতে বলো না…
এ কি শুধু হাসিখেলা প্রমোদের মেলা
শুধু মিছে কথা ছলনা!
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালী,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি
মিছা কথা কয়ে মিছা যশ লয়ে
মিছা কাজে নিশি যাপনা।
কে জাগিবে আজ কে করিবে কাজ—
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ
মায়ের পায়ে দিবে—সকল প্রাণের কামনা।

রবীন্দ্রনাথ এ-সময়ে আর একটি গান লিখেছিলেন—
তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ, তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।

* * * এ বীণা গাহিবে তোমারি গান। এ শুধু ধনীর দুলালের সৌখীন প্রাণের কাব্য-উচ্ছ্বাস নয়··রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-সাধনায় আমরা দেখি, এ-বাসনাকে তিনি চরিতার্থ করেছেন।

পাঁচ

কিশোর-চিত্ত করিল অমৃত পান

১৯০৭ সাল···বাঙলা ১৩১৪।

সাহিত্য-পত্রে তখন আমার ছোট গল্প নিয়মিতভাবে ছেপে বেরুচ্ছে। বন্ধুবর মণিলাল চাকরি করছিলেন সিমলা পাহাড়ে ···সরকারী চাকরি···সদ্য তাঁর বিবাহ হয়েছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা করুণা দেবীর সঙ্গে। এ-চাকরির পূর্ব্বে তিনি স্কুল ছেড়ে "ভাবতী" পত্রিকার সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেন। ভারতীতে গল্প-কবিতা লেখা নয় শুধু···ভারতীর সম্পাদিকা সরলা দেবীকে নানাভাবে সম্পাদনার কাজে সহায়তা করছিলেন। মণিলালই উদ্যোগী হয়ে রসরাজ অমৃতলাল বসু, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদকে ভারতীর জন্য লেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। ভারতীতে 'খেয়াল খাতা'র প্রবর্ত্তন হয়েছে এবং সরলা দেবী তখন দেশের লোকের মন থেকে 'গোরা'র ভয় দূরীকরণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। বাঙালীর ছেলেদের বীর্য্যসাধনার ব্যবস্থা হয়েছে···বীরাষ্টমী ব্রত, উদয়াদিত্য উৎসব

প্রভৃতির আয়োজন তিনি করেছেন—মণিলাল তাঁর প্রধান সহায়। বাল্যকালেই মণিলালের পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়েছিল। তাঁর দাদা রায়বাহাদুর মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় তখন গভর্ণমেণ্ট-অফ-ইণ্ডিয়ার ট্রেজারি বিভাগের বড় অফিসার। তিনি থাকেন সিমলায়। কিশোর মণিলালকে কলকাতায় অভিভাবকহীন না রেখে তাঁকে তিনি সিমলায় নিয়ে গিয়ে সরকারী চাকরিতে নিয়োগ করিয়েছিলেন। সাহিত্যের সঙ্গে সংস্রব হারিয়ে মণিলাল অস্থির ছিলেন···কিন্তু দাদার ইচ্ছা অমান্য করতে পারেন না···তাই কুইনিন গেলার মতো চাকরি করছিলেন। বিবাহের ক'মাস পরে অবনীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করলেন—ও-চাকরিতে কি বা ভবিষ্যৎ? তার চেয়ে মণিলাল কলকাতায় আসুন···তাঁর লেখা চলবে, সাহিত্য-চর্চা চলবে এবং কাজকর্মের জন্য তিনি পরামর্শ দেন, ছাপাখানার ব্যবসা করুন মণিলাল। দাদা মতিলাল এ-প্রস্তাবে রাজী হলেন এবং মণিলাল চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এলেন। থাকতে হলো অবনীন্দ্রনাথের গৃহে···৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে এবং ১৯০৮ সালের আষাঢ় মাসে তিনি খুললেন প্রেস। রবীন্দ্রনাথ এ-প্রেসের নামকরণ করলেন। প্রেসের নাম হলো কান্তিক প্রেস। প্রেসের এই নাম নিয়ে একটু মজা হয়েছিল। 'কান্তিক' কথার অর্থ আমরা বুঝিনি—ভেবেছিলুম, 'কান্তি'-যুক্ত হবে। হেসে রবীন্দ্রনাথ বললেন—'কান্তিক'

কথার অর্থ 'লোহা'। বহুকাল পরে বাল্যবন্ধু মণিলালকে পেয়ে সাহিত্য-চর্চায় আমারো উৎসাহ বাড়লো।

এ-সময়ে সরলা দেবী কলকাতা ত্যাগ করে লাহোরে বাস করছিলেন স্বামী পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে লাহোরে। পণ্ডিত রামভুজ ছিলেন লাহোরের বড় উকিল এবং কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ভদ্রলোক। ভারতী দেখবার জন্য না আছেন মণিলাল, না সরলা দেবী। ১৩১৪ সালের আষাঢ় মাসেও বৈশাখ সংখ্যা ভারতী বেরুলো না। সরলা দেবী এলেন কলকাতায়...শিশু-পুত্র দীপককে নিয়ে—দীপক তখন ছ'মাসের শিশু। ভারতী কি করে চলবে? তখন সরলা দেবী আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, ভারতীর-প্রকাশের ভার নিতে। আমাকে বললেন, পারিশ্রমিক দেবেন। আমি তাতে রাজী হলুম না। আমি তখন এম-এ এবং ল পড়ছি। আমি পারিশ্রমিক না নিয়ে ভারতীর কাজ করতে সম্মত হলুম। সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যসূচী তৈয়ারী। বৈশাখ মাসের জন্য তিনি আমাকে বললেন, একটি মাঙ্গলিক কবিতা লিখে দাও এবং সেই সঙ্গে একটি ছোট গল্প। আমাকে বললেন—সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে লেখা জোগাড় করতে হবে।

আমি গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করলুম। লেখা চাইতে তাঁরা সকলে বললেন, রেগুলার না হওয়া ইস্তক তাঁরা

লেখা দেবেন না। সরলা দেবী বললেন—একখানি উপন্যাস চাই। রবিমামা লিখবেন না···আমিও ধরেছিলুম···তিনি বলেছেন, বঙ্গদর্শনের সম্পাদকী ত্যাগ করেছেন···তবু শৈলেশ মজুমদারের তাগিদের অন্ত নেই···প্রায় সত্যাগ্রহ করতে চান শৈলেশ। তাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, উপন্যাস তিনি কিছুকাল লিখবেন না। তার উপর কাগজ রেগুলার না হলে তিনি কোনো লেখা দেবেন না।

উপন্যাস চাই···উপন্যাস না হলে মাসিকপত্র চলবে না—কোথায় পাওয়া যাবে উপন্যাস?

এর ক' বছর আগে···১৯০১ সালে আমি ভাগলপুরের কলেজ থেকে ফার্ষ্ট আর্টস পাশ করেছিলুম। ভাগলপুরে বহুকাল ছিলুম এবং তখন আমার বাল্যবন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টর গৃহে ভাগ্যক্রমে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হয়েছিল আমার আলাপ। তিনি তখন লিখেছেন বোঝা, কাশীনাথ, অনুপমার প্রেম, চন্দ্রনাথ, বড়দিদি প্রভৃতি বড় গল্পগুলি। 'বড়দিদি' গল্পটি আমি ১৯০১ সালে ভাগলপুর থেকে আসবার সময় সম্পূর্ণ কাপি করে এনেছিলুম···কলকাতার বন্ধুদের পড়াবো বলে। সে-কাপি আমার কাছে ছিল···সেই বড়দিদি গল্প দিলুম সরলা দেবীকে পড়তে। পড়ে তিনি চমকে উঠে-ছিলেন! বলেছিলেন—কী চমৎকার লেখা! ঠিক হয়েছে··· এ-গল্পটি তিন-ইস্যুতে ক্রমশঃ ছাপতে দাও—প্রথম দু-ইস্যুতে

লেখকের নাম থাকবে না···যে-ইস্যুতে গল্প শেষ হবে, সেই ইস্যুতে লেখকের নাম দেবো। লেখকের নাম থাকবে না··· পাঠক-পাঠিকা পড়ে ভাববেন, রবীন্দ্রনাথের লেখা! আমরা যেমন পিছিয়ে পড়েছি, এই লেখার জোরে গ্রাহক হারাবো না।

এবং এই কথামত কাজ হলো। বৈশাখের ভারতী বেরুলো···নামজাদা কোনো লেখকের লেখা নেই ভারতীতে ···'বড়দিদি'র একাংশ মাত্র ছাপা হলো। এটুকু ছেপে বেরুতে সাহিত্য-জগতে কি চাঞ্চল্য না জাগলো!

এ-সময়ে মণিলাল আছেন কলকাতায়···তিনি আসেন আমার কাছে···আমিও যাই তাঁর কাছে অবনীন্দ্রনাথের গৃহে··· হামেশা যাই এবং গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের স্নেহ অচিরে লাভ করলুম। তখন অবনীন্দ্রনাথের গৃহে ভারতীয় চিত্রকলার অনুশীলন চলেছে—নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার প্রভৃতি শিষ্যদের নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বসেন ছবি আঁকতে··· শিষ্যরাও আঁকেন—আমি ছবি আঁকা দেখি। কত গল্প হয়। ভারতীর 'বৈশাখ' সংখ্যা বেরুলে সেখানে গিয়েছি···শুনলুম, ওখানে বেশ চাঞ্চল্য—বড়দিদি কার লেখা···এই নিয়ে! আমি বললুম শরৎচন্দ্রের কথা। বললুম—তিনি ১৯০৩ সালের শেষাশেষি বর্মায় গিয়েছেন···সেই থেকে তাঁর কোনো খবর পাই নি! অবনীন্দ্রনাথ বললেন—চলো রবিকাকার কাছে।

তিনি কলকাতায় এসেছেন···তাঁকে বলবে হলো বড়দিদির কাহিনী।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে মণিলাল এবং আমি গেলুম রবীন্দ্রনাথের কাছে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন—ধরে এনেছি এ ছোকরাকে···এর জন্যই আপনার এতখানি কৈফিয়তী চলেছে।

ব্যাপার কি? পরিচয়াদি হলো···মণিলাল বললেন, তাঁর বন্ধু আমি। ছেলেবেলা থেকে কবিতা লিখি এবং এখন লিখছি গল্প। আমার হাতেই সরলা দেবী দিয়ে গিয়েছেন ভারতীর ভার।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাল্যকালে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর গৃহে—এ-কথা বললুম। তাঁর মনে পড়লো। তারপর বড়দিদির কথা।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—বড়দিদি গল্পে লেখকের নাম দাও নি···আমাকে তার জন্য বিপদে ফেলেছো! 'বঙ্গদর্শন' ত্যাগ করবার পর থেকে শৈলেশচন্দ্র উপন্যাসের তাগিদে আমাকে প্রায় কলকাতা-ছাড়া করে তুলেছিলেন। তাঁকে কথা দিয়েছিলুম, উপন্যাস কিছুকাল লিখবো না; যদি লিখি, তাহলে তাঁকেই দেবো বঙ্গদর্শনে সে উপন্যাস ছাপতে। ভারতীতে বড়দিদি বেরুতে শৈলেশচন্দ্র হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির···এসে আমার বিরুদ্ধে নালিশ—আপনি

বলেছিলেন, উপন্যাস লিখবেন না···লিখলে আমাকে দেবেন বঙ্গ-দর্শনের জন্য···কিন্তু তা না করে আপনি নাম না দিয়ে ভারতীর জন্য নূতন উপন্যাস লিখেছেন—বড়দিদি! আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম—না, না···বড়দিদি বলে উপন্যাস বা গল্প কিছুই লিখিনি। শৈলেশের বিশ্বাস হয় না···আমাকে পড়ালেন। পড়ে সত্যই আশ্চর্য্য হয়েছি—কে এই শক্তিমান লেখক! চমৎকার লেখা! মণিলাল আমাকে বলেছিল, তোমার পরিচিত বন্ধু···ভাগলপুরে থাকতেন···নাম শরৎ চাটুয্যে···বড়দিদি তাঁর লেখা।

আমি বললুম—তাই।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—কোথায় ইনি? তিনি আর কিছু লিখবেন না?

আমি দিলুম শরৎচন্দ্রের পরিচয় এবং তাঁর লেখা আরো গল্প লেখার বৃত্তান্ত। শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন—এঁকে টেলিগ্রাম করে বর্ম্মা থেকে নিয়ে এসো। এমন লেখক চুপচাপ বর্ম্মায় পড়ে থাকবেন···ভালো কথা নয়!

সেইদিন থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে সংযোগ স্থাপন হলো, মণিলালের সাহচর্য্যে সে-সংযোগ···তিনি যতদিন ছিলেন···সগৌরবে রক্ষা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এবং তাঁর সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে নানা ক্ষেত্রে যে-সব আলাপ-আলোচনা হয়েছিল···স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করে আজ সকলের সামনে তা প্রকাশ করছি।

১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে কোনো রকমে আমি বার করলুম···১৩১৪ সালের আশ্বিন-সংখ্যা ভারতী। টাকার অভাব···বড় লেখকরা কেউ লেখা দেবেন না, যতদিন না ভারতীকে রেগুলার করতে পারি! কোথায় পাবো ছাপাবার মতো লেখা? ভবানীপুরে আমাদের সমিতির যে-সব বন্ধুর লেখা প্রকাশযোগ্য মনে করি···সংগ্রহ করে ছাপাই; উপন্যাস নেই! শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' আষাঢ় সংখ্যায় শেষ হয়েছে··· তার কল্যাণে গ্রাহক হয়েছে মন্দ নয়! কিন্তু টাকাকড়ি যায় লাহোরে সরলা দেবীর কাছে। তিনি সেখান থেকে একটি পয়সা পাঠান না—তাগিদ দিলে লেখেন, বিজ্ঞাপনের টাকা যা উশুল হবে, তাই থেকে প্রেসের বিল ধীরে ধীরে মেটাবার চেষ্টা করো। বিজ্ঞাপনের টাকা কতই বা আদায় হয়! তখন রেট ছিল সামান্য···সে-সব বিল আদায় এবং শহরের গ্রাহকদের হাতে হাতে কাগজ ডেলিভারী দেবার জন্য দুজন পিয়ন আছে···তাদের মাহিনাতেই সে-টাকা ব্যয় হয়। অবস্থা এমন···'ভারতী'-ত্যাগ, নাহয় তার প্রকাশের সুব্যবস্থা করতে হয়। আমি একটি পয়সা নিই না··· ঘোরাঘুরিতে আমার গাঁটের পয়সা খরচ হয়। কিন্তু ভারতীর উপর এমন মমতা তখন যে, অর্থ-সামর্থ্য থাকলে নিজেই তার জোরে ভারতী চালাই! সে-সামর্থ্য ছিল না। আমি তখন কলেজে ল-লেকচার কমপ্লীট করেছি···এগজামিন

দিইনি···তার কারণ, এটর্নির অফিসে আর্টিকল আছি···
ল না দিয়ে এটর্নিশিপ পরীক্ষা দেবো।

আমি স্বর্ণকুমারী দেবীকে ধরলুম···বললুম—এত কালের ভারতী যদি বন্ধ হয়···বিশেষ আপনি থাকতে, তাহলে লজ্জার সীমা থাকবে না! আপনি নিন সম্পাদনার ভার!

তিনি রাজী হলেন···বললেন—অনেক কাল হলো এ-কাজ ছেড়েচি···এখনকার পাঠক-পাঠিকার মতিগতি জানি না···তবু ভার নেবো···কিন্তু তোমাকে লেগে থাকতে হবে আমার সঙ্গে। আমি রাজী। তখন স্থির হলো, আশ্বিন পর্য্যন্ত (১৩১৪) ভারতী যা বেরিয়েছে, ঐ আশ্বিনেই তার ও-বর্ষ শেষ হোক। যাঁরা এ-বছরে বার্ষিক মূল্য দিয়েছেন—বিজ্ঞাপনে জানাবো, ১৩১৫ সালের বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্য্যন্ত তাঁদের মূল্য দিতে হবে না···১৩১৪ সালের মূল্য থেকে ১৩১৫ সালের প্রথম ছ-মাসের মূল্য কাটান্ যাবে···তাঁরা বাকি ছ মাসের মূল্য দিলেই ১৩১৫ সালের 'ভারতী' আগাগোড়া বারো সংখ্যা পাবেন। ১৩১৪ সালের আশ্বিন সংখ্যার পর ও-বছরে ভারতী আর বেরুবে না···১৩১৫ সালের ১লা বৈশাখ বেরুবে নববর্ষের ভারতী···নূতন আয়োজনে স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায়—বিজ্ঞাপন বার করা হলো এবং মাঘ মাস থেকে চললো ১৩১৫ সালের ভারতী-প্রকাশের আয়োজন। আমাকে মণিলালকে নিয়মিত লিখতে হবে কবিতা আর গল্প।

আমার উপর আরো ভার দিলেন সম্পাদিকা, সাময়িক প্রসঙ্গ যা লেখা হবে···তিনি দেবেন মতামত···আমাকে সে-মতামত গুছিয়ে লিখতে হবে·· Editorial notes ; এবং সেই সঙ্গে করতে হবে···ভারতীতে সমালোচনার জন্য যে-সব গ্রন্থ আসবে, সে-সবের সমালোচনা। সাহিত্য-পত্রে মাসে মাসে তখন ছাপা হতো সম্পাদক সুরেশ সমাজপতির লেখা মাসিক সাহিত্য সমালোচনা। সে-সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের ভালো ভালো কবিতা-গল্প-প্রবন্ধের উপর অন্যায়ভাবে এমন বিদ্রূপ টিটকিরির মন্তব্য থাকতো যে, সে-সবের জবাবে অনেক কিছু বলবার জন্য মন চঞ্চল হতো! এজন্য বললুম—মাসিক সাহিত্য সমালোচনা সুরু করা যাক। স্বর্ণকুমারী দেবী নিষেধ করলেন ···বললেন—না···ওসব খেয়োখেয়ি আমি পছন্দ করি না।

বৈশাখ-সংখ্যা বেরুলো ১লা বৈশাখ···১৩১৫। প্রথমেই ছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর কবিতা—'আরতি'। তিনি লিখেছিলেন—

দাও নব বল, আনো সুমঙ্গল
হে বরদায়িনি ভারতি,
পুরাতন ব্রত করি উদ্‌যাপিত
নবোৎসাহে জ্বালি আরতি!

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন···রবীন্দ্রনাথ দিলেন একটি কবিতা—'প্রশ্রয়'। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর

গান ··মণিলালের ছোট গল্প···আমার কবিতা এবং বহু বিচিত্র সম্ভারে ভারতী বেরুলো। জ্যৈষ্ঠ থেকে স্বর্ণকুমারী দেবীর নূতন উপন্যাস 'অমর গুচ্ছ' ধারাবাহিক প্রকাশ হতে লাগলো। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'পথ ও পাথেয়' ভারতীর আষাঢ় সংখ্যায় ছাপা হলো। সাময়িক প্রসঙ্গ ছাপা হতো 'রাজ্যের কথা' হেডিং দিয়ে; তাছাড়া চয়ন এবং গ্রন্থ-সমালোচনা ছাপা হতে লাগলো নিয়মমতো। ছবি ছাপা হতো না মোটে। 'প্রবাসী' ওদিকে ছাপছেন ভারতীয় কলাপদ্ধতিতে অঙ্কিত ছবি···অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির আঁকা··· তিনরঙা ব্লকে। বাজারে মাথা তুলতে গেলে ছবি চাই। ১৩১৬ থেকে ভারতীতে একখানি করে তিনরঙা ছবি ছাপার ব্যবস্থা হলো···অবনীন্দ্রনাথের ছবি শুক-সারি-সংবাদ; তারপর সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লক্ষ্মণের শক্তিশেল প্রভৃতি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৯০৮ সালের আষাঢ় মাসে মণিলালের কান্তিক প্রেসে ছাপার কাজ সুরু হলো এবং আমার লেখা যৎকিঞ্চিৎ নাটিকা দিয়েই তাঁর এ-কাজ সুরু। পূর্ব্বেই বলেছি, প্রেসের নামকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—কান্তিক। মনে আছে, তাঁর কাছে বসে প্রেসের নামকরণ নিয়ে আলোচনা চলছিল···অনেকে অনেক নাম বলছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন—কান্তিক প্রেস। নামটি বলে তিনি প্রশ্ন করলেন—'কান্তিক' কথার অর্থ কি? প্রশ্নটা

নিক্ষিপ্ত হলো আমাদের দলের উপর (সত্যেন্দ্রনাথ, চারু বন্দ্যো, মণিলাল, আমি, কনকেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। 'কান্তি' কথা ধরে আমরা নানা জনে নানা অর্থ বলতে লাগলুম। হেসে রবীন্দ্রনাথ বললেন—না। 'কাস্তিক' কথার অর্থ লোহা। কাস্তিক প্রেস মানে লোহার যন্ত্র।

আমরা বিস্ময়ে বিহ্বল! মনে হয়েছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে এত গভীর জ্ঞান!

যাই হোক, এই ১৯০৮ সালের আষাঢ় মাস থেকে কাস্তিক প্রেসে (২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট) আমাদের আসর বসতে লাগলো নিত্য। চারুচন্দ্র এ-সময়ে কলকাতায় থাকেন···প্রবাসীর সহকারী-সম্পাদকতার ভার তখনো গ্রহণ করেননি—তিনি থাকেন কলকাতায়···এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের এখানকার কর্ম্মাধ্যক্ষ হয়ে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গ্রন্থ-প্রকাশের ভার পেয়েছেন তখন ইণ্ডিয়ান প্রেস। তাঁরা এখানে দোকান খুলেছেন ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে (এখনো ঠিক ঐ ঠিকানাতেই ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস বিদ্যমান আছে)। চারুচন্দ্রের সঙ্গে এই সময়ে আমাদের আলাপ এবং এ-আলাপ সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হলো। এই আসরে আবার ফিরে পেলুম সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে···কলেজ-ত্যাগের চার বৎসর পরে। আসরে আমরা নিত্য সমবেত হতুম···সত্যেন্দ্র দত্ত, চারু বন্দ্যো, মণিলাল এবং

আমি (সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জাপান থেকে ফেরবার পর আমাদের আসরে যোগ দিলেন) এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সাহিত্য-আলোচনা চলতো···নিজেদের লেখা পড়ে শোনানো হতো···সে সব লেখার আলোচনা চলতো এবং আমরা প্রায় যেতুম অবনীন্দ্রনাথের গৃহে। তিনি কত কথা বলতেন···কত গল্প···পুরোনো দিনের গল্প···চিত্রকলার আলোচনা; এবং রবীন্দ্রনাথ তখন প্রায় আসতেন কলকাতায়···বোলপুর থেকে। আমাদের ডেকে নূতন লেখা পড়ে শোনাতেন। তাঁর সঙ্গেও মেলামেশা চলতো—তিনি এমনভাবে মিশতেন আমাদের সঙ্গে যেন সমবয়সী বন্ধু!

এ-সময়ে আমরা কজনে বিরক্ত হতুম···রাগে জ্বলতুম—সাহিত্য-পত্রে রবীন্দ্রনাথের ভালো ভালো লেখার উপর সুরেশ সমাজপতি মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় যে-সব বিদ্রূপ বর্ষণ করতেন···তার জন্য। সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্য পত্রে মাসে মাসে কবিতা লিখতেন···আমিও দু-তিন মাস অন্তর একটি করে গল্প লিখছি সাহিত্যের জন্য। রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর এ-অন্যায় মন্তব্যে সাহিত্য-পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ এবং আমি লেখা দেওয়া বন্ধ করলুম।

সাহিত্য-পত্রের সমালোচনার দু-চারটি দৃষ্টান্ত দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সে-সব কথা এখনকার পাঠক-সমাজে রূপকথার দৈত্য-দানার গল্পের মতো শোনাবে!

রবীন্দ্রনাথের সেই চমৎকার গানটি—

আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।

এ-গানটি তিনি গেয়ে শুনিয়েছিলেন—যেমন বাণী, তেমনি ভাব এবং তেমনি সুর। আমরা মুগ্ধ হয়েছিলুম। কিন্তু এই গান মাসিকে ছাপা হলে সাহিত্য-পত্রে এর সমালোচনা বেরুলো! ঐ দুটি ছত্র তুলে একটি লাইন টিপ্পনী! সাহিত্য-সম্পাদক লিখলেন—'বাঙ্গালায় লিখিত, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের কাছে গ্রীক।' তার পর আরো দুটি লাইন উদ্ধৃত করেছিলেন···সে দুটি লাইন—

দিকে দিগন্তে যত আনন্দ
লভিয়াছে এক গভীর ছন্দ হে।

এ দুটি লাইন তুলে 'সাহিত্যে'র টিপ্পনী—'অত্যন্ত মৌলিক···কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থহীন। আনন্দের গভীর ছন্দ বোধ করি আকাশ-কুসুমের সৌরভের মত! প্রতিভাশালী কবি ভিন্ন অন্য কাহারও 'নাসাগম্য' নয়। রবীন্দ্রবাবু অনেক লিখিয়াছেন, অনেক ছাপিয়াছেন, এখনও তিনি যা-তা ছাপাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না—ইহা আমাদের বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়।'

রবীন্দ্রনাথের সামনেই এ-সমালোচনা তাঁকে পড়ে শুনিয়ে

সত্যেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন—কাসাবিয়াঙ্কা আর জন জিলপিন মানে করে পড়ে যারা বলে, চমৎকার কবিতা… এ-জন্মে তারা এ-সব বুঝবে না! রবীন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন —জ্যোতিষের মতে আমার বোধ হয় বৃশ্চিকের দশা চলেছে, সত্যেন্দ্র…সারা জীবন বৃশ্চিক-দংশন সহ্য করে চলেছি।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। রবীন্দ্রনাথের সেই গান— 'মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী'…এ-গানের শেষের কটি ছত্র—

জাগো আকুল ফুলসাজে,
জাগো নবকম্পিত লাজে
মম হৃদয়-শয়ন মাঝে,
শুন মোহন মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি।

এই গানের প্রথম তিনটি ছত্রের পরে একটি করে কমা আছে…কাজেই অর্থ আমরা বুঝি। কবি বলছেন—আকুল ফুলসাজে জাগো…মৃদু কম্পিত লাজে জাগো মম হৃদয়-শয়ন মাঝে—জেগে কি শুনবেন? না, মম অন্তরে থাকি থাকি মোহন মুরলী বাজে! সাহিত্য-সম্পাদক ঠাট্টা করবেন বলেই কমাগুলি বাদ দিয়ে এ-কটি ছত্র উদ্ধৃত করে টিপ্পনী কাটলেন— হৃদয়-শয়ন মাঝে মধুর মুরলী বাজা—সে আবার কি!' সমালোচনা পড়ে আমরা অবাক! মোহন মুরলী অন্তর

মাঝে বাজে…সে-বাজা শুনবেন হৃদয়-শয়ন মাঝে থেকে—সকলেই এ-অর্থ সহজে বুঝবেন…কিন্তু 'সাহিত্য' শুধু তা বুঝবেন না!

এ নিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে যখন উষ্মা প্রকাশ করতুম, তিনি বোঝাতেন—কবিতা গান…এ-সব বস্তু মন দিয়ে বোঝবার…মনের উপভোগ্য…নিজের মন দিয়েই তা উপলব্ধি হয়—সমালোচকের কথায় যে-উপলব্ধি…সে এগজামিন পাশ করার উপলব্ধি! ডাউডেন আর জার্ভাইনাশের লেখা পড়ে যে-মানুষ সেক্সপীয়ারের রস উপলব্ধি করতে চায়…তার কাজ টেক্সট-বুক আর টেক্সট বুকের অর্থপুস্তক লেখা। ডাউডেন, জার্ভাইনাশ পড়বো না কি? পড়বো। তাতে সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির সাহায্য মিলবে। সকলে পারপূর্ণভাবে রস উপলব্ধি করতে পারে না—তাদের পক্ষে ও-বইগুলি মস্ত সহায়। সেক্সপীয়ারকে গালাগাল দিয়েছে…এমন সমালোচকের লেখা পড়েছি…কিন্তু তাতে সেক্সপীয়ারের কোনো অনিষ্ট হয় নি…হতে পারে না!

কিন্তু যাক, যে-কথা বলছিলুম…বঙ্গভঙ্গ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কি করে জাতির—শুধু বাঙালীর নয়…ভারতবাসীর চেতনা জাগালেন!

এই সময়েই তিনি লিখলেন—

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এ দেশে—
সার্থক জনম মাগো
তোমায় ভালোবেসে।
জানিনে তোর ধন-রতন
আছে কি না রাণীর মতন—
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে!
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদবো নয়ন শেষে।

এ তো মায়ের কথা···দেশ-জননীর পরিচয় দেওয়া!

তারপর জাতিকে ভরসা দেওয়া, সাহস দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—

নিশিদিন তুই ভরসা রাখিস
ওরে মন, হবেই হবে!

যদি পণ করে থাকিস
সে-পণ তোর রবেই রবে,
ওরে মন, হবেই হবে।

আরো-আরো গাইলেন—

প্রচণ্ড গর্জ্জনে এ কী আসিল দুর্দিন
ছাড়ো হে লজ্জা, জাগো ভীরু অলস
আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি……

এবং

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি
বারে বারে হেলিস্ নে ভাই—

তারপর আবার মাতৃ-আহ্বান—মায়ের স্তুতি…

মা কি তুই পরের দ্বারে
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?
তারা যে করে হেলা মারে ঢেলা
ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে।

এখানেও সেই আবেদন-নিবেদনের উপরে বিরাগ)

করেছি মাথা নীচু চলেছি যাহার পিছু
যদি-বা দেয় সে কিছু অবহেলে…
তবু কি এমনি করে ফিরবো ওরে
আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে।

কিশোর-চিত্ত করিল অমৃত পান

নেবো গো মেগে পেতে, যা আছে তোর ঘরেতে
দে গো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে
আমাদের সেইখেনে মান সেইখেনে প্রাণ
সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে।

এবং সর্ব্বশেষে সেই অমর বাণী—

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চলো রে
একলা চলো একলা চলো
একলা চলো রে।

এ-গানে মহাত্মা গান্ধিজীর inspiration !

এই কটি গান থেকে সকলে বুঝবেন, সব ন্যাশনালিষ্টের মাথার মণি ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। এ-কথার আগে··· বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

আগে চল, আগে চল, আগে চল ভাই
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই ?

বলেছিলেন—

পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও···
নিয়ে যাও সাথে করে—
কেহ নাহি আসে, একা চলে যাও···
মহত্ত্বের পথ ধরে !

এবং এই একলা চলার গান···শেষে···একলা চলো, একলা চলো রে।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে তিনি আরো বলেছিলেন—

আমি ভয় করবো না ভয় করবো না
দুবেলা মরার আগে মরবো না ভাই, মরবো না।
তরীখ'না বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধরবো না।

শুধু কথা আর গান নিয়েই তিনি দেশের প্রতি, দেশবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য শেষ করেন নি! শুধু বাক্য নয়··· আচারে কাজে তিনি উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। 'ভাণ্ডার' মাসিকপত্রের সম্পাদনা-ভার নিয়ে তিনি দেশীয় শিল্পাদির পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছিলেন এবং কেদারনাথ দাশগুপ্তর সঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'···দেশীয় পণ্যশিল্পের বিপণী। এ বিপণী খোলা হয়েছিল ১৯০৫ সালে।

National Education-এর প্রবর্ত্তন হলো এই সময়েই —জাতীয়ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা···এ ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের স্বপ্ন! জাতীয়-শিক্ষার প্রবর্ত্তন কি করে হবে···

কি তার ধারা—এ-সম্বন্ধে তিনি বহু সভায়···বীডন্ স্কোয়ার প্রভৃতি স্থানে প্রবন্ধ পড়ে, বক্তৃতা করে দেশের তৎকালীন নেতাদের এবং সাধারণকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারত-দর্শনের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং তাঁকে অভিনন্দন-অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য কংগ্রেস থেকে প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছিল···কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে···মহামতি গোখলের অধিনায়কত্বে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এ-অভিনন্দন-জ্ঞাপনের বিরুদ্ধে।

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন তাঁর শিক্ষা-সমস্যা প্রবন্ধ এবং 'ততঃ কিম' প্রবন্ধ; এবং জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ স্থাপিত হলে (১৯০৬···১৪ই অগষ্ট) তিনি পরিষদে অনেকগুলি চিন্তাশীল প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।

এই সময়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের চক্রান্তে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ-নীতি-সৃষ্টির সূচনা হয়···রবীন্দ্রনাথ তখনি দেশকে করেন সচেতন 'ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' প্রবন্ধ লিখে।

বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্বে ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ গঠনের ব্যবস্থাকল্পে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধ পাঠের সঙ্গেই তিনি তাঁর কর্ত্তব্য শেষ করেন নি। স্বদেশী সমাজের উদ্দেশ্য, গঠন এবং সদস্যদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ

করেছিলেন, তা পাঠ করলে সকলে বুঝবেন পোলিটিকাল প্ল্যাটফর্ম্মে বক্তৃতা না দিলেও তাঁর দেশানুরাগ এবং দেশ-সেবার আদর্শ ছিল কি···তার পা িচয়। এ-সম্বন্ধে তাঁর লিখিত বিজ্ঞপ্তি উদ্ধৃত করলুম :—

আমরা স্থির করিয়াছি, আমরা কয়েকজনে মিলিয়া একটি সমাজ স্থাপন করিব। আমাদের নিজেদের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাব মোচন ও কর্ত্তব্য সাধন আমরা নিজে করিব। আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব। যে-সকল কর্ম্ম আমাদের স্বদেশীয়ের দ্বারা সাধ্য···তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে আমাদের সমাজের বিধি আমাদের প্রত্যেককে একান্ত বাধ্যভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথা করিলে সমাজবিহিত ন স্বীকার করিব।

বাঙালীমাত্রেই এ-সমাজে যোগ দিতে পারিবেন। সাধারণতঃ ২১ বৎসর বয়সের নীচে কাহাকেও গ্রহণ করা হইবে না।

এ-সভার সভ্যগণের নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্মতি থাকা আবশ্যক।

(১) আমাদের সমাজের ও সাধারণতঃ ভারতবর্ষীয় সমাজের কোনো প্রকার সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার জন্য আমরা গভর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইব না।

(২) ইচ্ছাপূর্ব্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিব না।

(৩) কর্ম্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙালীকে ইংরেজিতে পত্র লিখিব না।

(৪) ক্রিয়াকর্ম্মে ইংরেজি খানা, ইংরেজি সাজ, ইংরেজি বাদ্য, মদ্যসেবন এবং আড়ম্বরের উদ্দেশ্যে ইংরেজ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ করি, তবে তাহাকে বাংলা রীতিতে খাওয়াইব।

(৫) যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারি, ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশীচালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পাঠাইব।

(৬) সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কোনো প্রকার বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে আদালতে না গিয়া সর্ব্বাগ্রে সমাজ-নির্দ্দিষ্ট বিচার-ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

(৭) স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্য ক্রয় করিব।

(৮) পরস্পরের মধ্যে মতান্তর ঘটিলেও বাহিরের লোকের নিকট সমাজ বা সামাজিকের নিন্দাজনক কোনো কথা বলিব না।

এ-বিজ্ঞপ্তি বাঙলা দেশের সকল প্রতিষ্ঠানকে পাঠানো হয়েছিল।

বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁর Indian Nationals in its principles and personalities গ্রন্থে লিখে গেছেন—It was Rabindranath who had first preached the duty of eschewing all voluntary association with official activities and of applying ourselves to the organisation of our economic social and educational life, independently of official help and control. Though the boycott of British goods as a protest against the partition of Bengal originated with others and was adopted by the political leaders of the country ···it was Rabindranath who first propounded an elaborate scheme for the practical boycott of the adminstration to the furthest limits that the laws of the land allow us to do.

মহাত্মা গান্ধিজীর নন-কো-অপারেশন আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব থেকে রবীন্দ্রনাথই যে তার মূল···তা উপলব্ধি হবে।

বোলপুর শান্তিনিকেতনে এই আদর্শ তিনি শিক্ষাধারায় প্রবর্ত্তন করেন। ক্লাশের বদ্ধ ঘরে ঘড়ির কাঁটা দেখে থামচে থামচে এ-বইয়ের একপাতা, ও-বইয়ের দু পাতা কোনো-তে গলাধঃকরণ করানো নয়, ছাত্রছাত্রীর উপর চাপ নয়

—খোলা বাতাসে…মানে, গাছতলায় বসে গল্পচ্ছলে জ্ঞান বিতরণ…খেলাধূলা…নাচ গান বাজনা চিত্রকলা প্রভৃতির অনুশীলন—ছোট বয়স থেকে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলবার জন্য নিজের নিজের হাতে জামা-কাপড় কাচা, নিজের নিজের উচ্ছিষ্ট বাসন ধোওয়া, শয্যা রচনা করা—এতে মানুষ কি সুন্দর ভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে…পৃথিবীর বুকে practical হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। শুধু তাই নয়, মাটির দেয়াল খাড়া করে সে-সব দেয়ালের মাথায় তৃণপর্ণের আচ্ছাদন দিয়ে আশ্রয়-নীড় রচনা—এ-কাজেও ছেলেমেয়েদের নিপুণ করে তোলার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। অর্থাৎ মানুষকে বাঁচতে হলে…অপরের উপর নির্ভর না রেখে যা-যা করতে হবে, করতে হতে পারে…সব দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি ওখানে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।—শিক্ষার এ-আদর্শ শুধু প্রচার করা নয়…আদর্শ মেনে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া…সহজ শক্তির কথা নয়!

শান্তিনিকেতনে এ-আদর্শে শিক্ষাদান-কার্য্যে যোগ্য কজন সহকর্ম্মীরও অভাব হয়নি। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ…নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। সম্মান-মর্য্যাদাজ্ঞান এবং সম্মানহানি কিছুতে নয়—এই শিক্ষা তিনি যেমন গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে দিয়েছেন…নিজেও তেমনি নিষ্ঠাভরে এ-সম্মান রক্ষা করে চলেছেন আজীবন।

ছয়

রবীন্দ্র-বিদ্বেষ : জোড়াসাঁকোর বাড়ীর আসর

১৯০৫-০৬ সালে কংগ্রেস নেতাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা হলো বেশ…তাঁরা চাইলেন রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসে যোগ দিন…কিন্তু কংগ্রেসের মূল নীতি…আবেদন-নিবেদন—তার বিরোধী তিনি চিরদিন।

তাঁর এ-প্রতিষ্ঠায় দু-চারজন সাহিত্যরথীর মনে জেগেছিল দারুণ হিংসা। এঁরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে পুরোবর্তী করে সাহিত্যের আসরে নামলেন রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে হেয় করতে। ১৯০৬ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পূর্ণিমা-সম্মেলনের ব্যবস্থা করলেন। এক-এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় সাহিত্যরসিক এক-একজন ধনীর গৃহে বসতো এ-মিলনীর আসর। এ-আসরে গান-বাজনা-আবৃত্তি, কখনো-বা কবিতা বা প্রবন্ধ পাঠ হতো এবং বেশ ভালো রকমে নিমন্ত্রিতদের জলযোগ করিয়ে গৃহস্থ করতেন অতিথিদের বিদায়। এ-সম্মিলনীর সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়…নিমন্ত্রণ-লিপিতে তাঁর নাম ছাপা হতো সম্মিলনীর সম্পাদক বলে এবং যাঁর গৃহে আসর বসতো…তাঁর নাম ছাপা হতো আহ্বায়ক বলে। প্রতি আসরে আমি পেতুম নিমন্ত্রণ-লিপি এবং সব আসরেই হাজির হতুম। একবার…শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা…ষ্টার

থিয়েটার-গৃহে পূর্ণিমা মিলনের আসর বসে…১৯০৬। থিয়েটারের অডিটোরিয়াম থেকে ষ্টল এবং সামনের যত চেয়ার সরিয়ে দীর্ঘ পাটাতনে ফরাশ জাজিম পাতা হয়েছিল অভ্যাগতদের বসাবার জন্য। এ-আসরে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং দেবকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রলালের অনুরক্ত বন্ধুরা তো ছিলেনই…তাছাড়া অমৃতলাল বসু, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতি সাহিত্যিকরাও ছিলেন। গিরিশচন্দ্রও এসেছিলেন এ-আসরে। আসরে হঠাৎ দেখি, দেবকুমার রায়চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন…দ্বিজেন্দ্রলাল ঘোষণা করলেন —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে-ঢংয়ে আবৃত্তি করেন…মেয়েলিপানা ভাব, গায়ের চাদর উড়ে পড়ছে এলানো আঁচলের মতো এবং কণ্ঠ অস্বাভাবিক অদ্ভুত করে…দেবকুমার রায়চৌধুরী হুবহু তাঁর নকলে আবৃত্তি করবেন রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কবিতা। এবং সেই ব্যাপারই হলো। দেখে গিরিশচন্দ্র বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন— এর নাম সাহিত্য-মিলন! রবীন্দ্রনাথের মতো কবিকে তাঁর অসাক্ষাতে এমন করে ভ্যাংচানো! এ-কথা বলে তিনি তৎক্ষণাৎ আসর ত্যাগ করে গিয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের এ-বিদ্বেষ এখানেই শেষ হলো না। তিনি অচিরে 'সোনার তরী' কবিতার এক বিকৃত ব্যাখ্যা করে প্রবন্ধ লিখে ছাপালেন প্রবাসীতে। প্রবন্ধে লিখলেন,

এ-কবিতার অর্থ হয় না…হেঁয়ালি…লাগসে কতকগুলো কথা সাজানো মাত্র! সে-লেখার তীব্র প্রতিবাদ উঠেছিল। স্যর যদুনাথ সরকার (তখন তিনি স্যর হন নি) সোনার তরীর চমৎকার ব্যাখ্যা করে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সে-প্রবন্ধও প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল। কিন্তু জের এইখানেই মিটলো না।

এই সময়ে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় থেকে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক' বলে একখানি বই ছাপা হয়। সে-বইয়ে বঙ্গবাসীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী-পরিচয় লিখে দিয়েছিলেন। সেইটি পড়ে দ্বিজেন্দ্রলালের আক্রোশ আরো বাড়ে। ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্য' পত্রে তিনি প্রবন্ধ ছাপালেন 'কাব্যে নীতি'। তার মুখবন্ধে নীতির সম্বন্ধে গুরু-গম্ভীর দু-চার কথা বলে তিনি লিখলেন—"রবীন্দ্রবাবুর প্রেমের গানগুলি নিন—'সে আসে ধীরে', 'ও কেন চুরি করে চায়', 'দুজনে দেখা হলো' ইত্যাদি।"

দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন—"আশ্চর্য্যের বিষয়…এই সব গানে মৌলিকতাও নাই! শয়ন রচনা করা, মালা গাঁথা—এ সকল ব্যাপারে বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইতে অপহরণ …তবে রবিবাবুর কবিতায় বৈষ্ণব কবিদিগের ভক্তিটুকু নাই, লালসাটুকু বেশ আছে।"

তিনি আরো লিখেছিলেন—"চিত্রাঙ্গদা"…রবীন্দ্রবাবুর ভক্তদের বড় প্রিয় কি না! * * * রবীন্দ্রবাবু অর্জ্জুনকে কিরূপ

জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন···তাঁর অদ্ভুত কোর্টশিপ! —এ-কোর্টশিপে একজন সামান্যা ইংরাজ রমণী সম্মত হইতেন না। * * * অর্জ্জুন একজন কুমারীর ধর্ম্মনষ্ট করিলেন—একটু ইতস্তত করিলেন না। * * * বর্ষকাল ধরিয়া একটি ভদ্রমহিলাকে সম্ভোগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে-অর্জ্জুনের সারথ্য করিলেন···যিনি এত জিতেন্দ্রিয় যে উর্ব্বশীর প্রেমও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, যিনি বেশ্যাসক্তিও অনুচিত মনে করিতেন, তিনি রবীন্দ্রবাবুর হাতে পড়িয়া অনায়াসে একটি রাজকন্যার ধর্ম্মনাশ করিলেন! আর চিত্রাঙ্গদা? বেচারী মা আমার! বঙ্গ কবিবরের হাতে পড়িয়া তোমার যে এহেন দুর্গতি হইবে, তাহা বোধহয় তুমি স্বপ্নেও কল্পনা কর নাই।" ইত্যাদি।

দ্বিজেন্দ্রলালের এ-প্রবন্ধের প্রতিবাদে বিখ্যাত সুধী সমালোচক প্রিয়নাথ সেন বড় প্রবন্ধ লিখে চিত্রাঙ্গদা-কাব্যের বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলেন। সে-প্রবন্ধ ঐ বছরের অগ্রহায়ণ সংখ্যা সাহিত্য-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। কাব্যের বিশদ ব্যাখ্যা করে তার সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধের শেষাংশে প্রিয়নাথ সেন লিখেছিলেন—"তর্কের অনুরোধে বলি, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে এই courtship চিত্র বিরল নয়। রবিবাবুর বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তাঁহার রচিত ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্যে এই courtship-এর

যে মধুর চিত্র চিরকালের জন্য আঁকিয়া গিয়াছেন···তাহা জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। শকুন্তলার এ courtship—জার্ম্মানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তার সৌন্দর্যে; যে অনুপম চতুষ্পদী লিখিয়া গিয়াছেন···তাহা শকুন্তলার পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। শকুন্তলায় দ্বিজেন্দ্রবাবু আপত্তিকর আর একটি বিষয় দেখিতে পাইবেন। দুষ্মন্ত-দর্শনে মদনতাপপীড়িতা শকুন্তলা যখন তন্নিবন্ধন অসুস্থদেহা হইলেন, তখন তাঁহার সখীদ্বয় তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য শকুন্তলাকে রাজার নিকট স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন এবং রাজাকে একখানি মদনলেখ লিখিতে বলেন।"

সুপণ্ডিত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও দ্বিজেন্দ্রলালের এ-ধৃষ্টতা সহ্য করতে পারেন নি। তিনিও ঐ সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রে চিত্রাঙ্গদার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখে প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে ললিতকুমার লিখেছিলেন—"রবীন্দ্রনাথের যশঃ-সূর্য্যের কালমেঘরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্য-আকাশে উদিত।"

'মানসী' পত্রিকায় অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত দ্বিজেন্দ্রলালের এ-প্রবন্ধের প্রতিবাদে একটি সার-কথা লিখে-ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—"রামায়ণ হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল সীতা নাট্যকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। সে-নাট্যকাব্যে একটি দৃশ্যে রামচন্দ্র অত্যন্ত অপরাধীর মত বসিয়া আছেন···আর

লব লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়িতেছেন—'কি বোলবো, তুমি বাবা…তায় বয়সে বড়…তাই তোমাকে মায়া করতে হচ্ছে… নাহলে তুমি যে-অন্যায় কাজ করেছো তার জন্যে ছ্যাখো, লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তোমার ছেলে বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে!' রাম সমস্ত দোষ কবুল করে বললেন—'বাবা লব, আমার দোষ হয়েছে…ঘাট হয়েছে।' দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্মীকিকেও টেক্কা দিয়াছেন!"

এই 'সীতা' নাটকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে আর একজন সমালোচক লিখেছিলেন—"এ রামচন্দ্রের ছেলে লব! আশ্চর্য্য! মুখের কথা ম্যাথর-মুর্দ্দফরাসের ঘরের ছেলের মতন!"

'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের আর এক অভিযোগ ছিল—রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ গানে…শয়ন রচনা করা, মালা গাঁথা প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবিতা থেকে 'অপহরণ' করেছেন! ও-সব গানে কোনো মৌলিকতা নেই! এ-কথার জবাব দিয়েছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'কাব্যে অপহরণ' নামে এক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল ১৩১৬ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'মানসী' পত্রিকায়।

সত্যেন্দ্রনাথ পাশাপাশি তুলে গিয়েছিলেন…রবীন্দ্রনাথের গানের কোন্-কোন্ ছত্রের ভাব-ভাষা দ্বিজেন্দ্রলাল আত্মসাৎ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর গান

মান করে থাকা আর কি সাজে···

মান-অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে

চল, চল কুঞ্জমাঝে।

এই গানের ভাব-ভাষা দেখি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দুর্গাদাস নাটকের তৃতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যের গানে। সে গানটি—

মান-অভিমান আর কি সাজে

মানের তরী ভাসিয়ে দিয়ে

ঝাঁপ দেবো এই তুফান মাঝে।

রবীন্দ্রনাথের গান :—

আয়রে ভবের খেলা সেরে

আঁধার করে এসেছে যে!

দ্বিজেন্দ্রলালের গান :—

চাহে কেবা রইতে ভবে

আঁধার করে আসে যবে।

রবীন্দ্রনাথের গান :—

শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি

অঞ্চল উড়ে চঞ্চল।

দ্বিজেন্দ্রলালের গান :—

বসে আছি পাতি অঞ্চল

অতি শঙ্কিত কম্পিত চঞ্চল

রবীন্দ্রনাথ :—

বনে এত ফুল ফুটেছে
মান করে থাকা আর কি সাজে···
কোকিলে গেয়েছে কুহু
মুহু মুহু কাননে ঐ বাঁশী বাজে।

দ্বিজেন্দ্রলাল :—

বনে কত ফুল ফুটেছে
কুঞ্জতরুর শাখে শাখে—
কুহু কুহু কুহু স্বরে
পাতার মধ্যে কোকিল ডাকে।

রবীন্দ্রনাথ :—

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নহি। অবহেলা করি ভুলিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি।

(চিত্রাঙ্গদা)

দ্বিজেন্দ্রলাল :—

আমি নহি বিদ্যুৎ কি জ্যোৎস্না
কি সঙ্গীত।

আমি মাত্র তারা ··

দোষ আছে, গুণ আছে।

(তারাবাঈ)

রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে—

মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই

এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে।

দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন তাঁর নূরজাহান নাটক। নূরজাহান বলছেন—

আমি মর্ত্তে চাই না···আমি এই পৃথিবীকে বড় ভালোবাসি। এমন সূর্য্যকিরণ···পুষ্পের সৌরভ!

এ-সময়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একদল লোক যেমন তাঁকে এমনি উত্যক্ত করতে লাগলো···তখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের কলেরা-রোগে মৃত্যু (নভেম্বর···১৯০৭)—তাঁর লেখনীতে তখন প্রবাসী পত্রে মাসে মাসে 'গোরা' ফুটে উঠছে— কংগ্রেসের নেতৃবর্গ তাঁকে তখন নিবিড়ভাবে কামনা করছে— শুধু কামনা নয়, সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে পরামর্শাদিও করছেন। ১৯০৮ সালে জানুয়ারি মাসে পাবনায় হলো বঙ্গীয় প্রাদেশিক··· Bengal Provincial Conference-এর অধিবেশন। সে-অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ হলেন সভাপতি নির্ব্বাচিত এবং কংগ্রেসের ইতিহাসে যা কখনো হয় নি···তাই হলো!

সভাপতি রবীন্দ্রনাথ অভিভাষণ দিলেন বাঙলা ভাষায়। এ-অভিভাষণে তিনি গঠনমূলক বহু প্রস্তাব জানিয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। দেশের তরুণদলকে বলেছিলেন—গ্রামে গ্রামে গিয়ে হিন্দু-মুসলমানকে ঐক্য-সূত্রে বন্ধনের কাজ করুন। বাঙালী এক জাতি···সে-জাতির ধর্ম্মভেদ নেই এবং হিন্দু-মুসলমান মিলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করুন—দেশে যেন নিরক্ষরতা না থাকে। তাছাড়া গ্রামে পথ-ঘাট তৈরি করুন ···পুষ্করিণী এবং কূপ খনন করুন—মানুষ যাতে পিপাসায় জল পায়, ক্ষেতে জল পায়। এমনি সব গঠনমূলক কাজে প্রবৃত্ত হবার প্রেরণা তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন!

শান্তি নিকেতন থেকে মাঝে মাঝে তিনি কলকাতায় আসতেন এবং ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে মজঃফরপুরে প্রথম যখন বোমায় মনের আগুন ছুটলো, তখন 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধ লিখে চৈতন্য লাইব্রেরীর এক বিশেষ অধিবেশনে সে-প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। তাতে তিনি এ হিংস্র নীতির নিন্দা করে-ছিলেন। এই ঘটনার অব্যবহিতকাল পরেই মাণিকতলা মুরারিপুকুরের বাগানে বারীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি গ্রেফতার হন··· বোমার কারখানা করার অপরাধে। তখন ইংরেজের নির্য্যাতন-নীতি রুদ্ররূপে জেগে উঠলো! তখনো রবীন্দ্রনাথ এ-সব সাহসী তরুণের ত্যাগের মহিমাকীর্ত্তন করেছিলেন···কিন্তু সেই সঙ্গে এ হিংস্র নীতি বর্জ্জনের উপদেশ দিয়েছিলেন।

ইংরেজ তখন হিন্দু-মুসলমানে ভেদ-নীতিব সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে 'সদুপায়' প্রবন্ধ লিখে ইংরেজের এ-কূটনীতি বুঝিয়ে হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে আবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে কার্পণ্য করেন নি। এ-সময়ে কবি রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির ক্ষেত্রে যে-কাজ করলেন…তা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে অমর অক্ষরে লিখিত আছে!

১৯০৮-০৯-১০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখনই কলকাতায় এসেছেন…আমরা তাঁর কাছে গিয়েছি। গল্প উপন্যাস লেখার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতুম…তিনি দিতেন নানা উপদেশ। এবং ১৯১০ সালে ঠাকুরবাড়ীর বিশিষ্ট এক আত্মীয়ের গৃহে বিবাহ-সভায় আমরা বন্ধুর দল (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আমি) তাঁর গল্প এবং গান যাতে জনপ্রিয় হয়, সেজন্য 'মুক্তির উপায়' গল্পটি নাট্যাকারে রূপায়িত করে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করানোর অনুমতি চাই। তিনি অনুমতি দিলেন এবং গল্পটির নাট্যরূপ লিখে তাঁকে পড়ে শোনাই। তিনি সেটি মনোনীত করলে ১৯১১ সালের মার্চ মাসে সে-গল্পটি 'দশচক্র' নামে অমৃতলাল বসুর ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। সে-অভিনয় বেশ জমেছিল এবং সাধারণের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে 'দশচক্র' স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে ছেপে বার করা হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্প…অপরে

তার নাট্যরূপ দিয়েছে এবং সে-নাট্যরূপ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে ছাপা হয়েছে…এ-দৃষ্টান্ত বোধ হয় আর নেই! এ-গৌরব দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাকে কতখানি স্নেহ করেছিলেন…আমি তা মর্ম্মে মর্ম্মে জানি।

গল্প উপন্যাস লেখার সম্বন্ধে তিনি দিতেন আমাদের নানা উপদেশ। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি একটি উপন্যাসের প্লট দিয়েছিলেন এ-সময়ে। সে প্লট নিয়ে চারুচন্দ্র লেখেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'স্রোতের ফুল'। আমাদের বলেছিলেন —প্লট চাও? আমরা বলেছিলুম—না। কি করে উপন্যাস লিখবো…বলে দিন। তখন রবীন্দ্রনাথ বলেন—সেরা বিদেশী উপন্যাস বাঙলায় অনুবাদ করতে। লাইন ধরে অনুবাদ নয়…বিদেশী উপন্যাস পড়ে মূল কাহিনীটিকে নিজের ভাষায় বেশ সাবলীল ভঙ্গীতে লিখতে হবে। বিদেশী উপন্যাসের মধ্যে যে-সব ঘটনা বা চরিত্রাদি আমাদের দেশের পাঠকসমাজ ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না, তা বাদ দিলেও দোষ হবে না। এ-অনুবাদে শিক্ষা হবে… উপন্যাসের theme কি করে নানা ঘটনা এবং নানা চরিত্র-সমাবেশে সুস্পষ্টভাবে ব্যঞ্জিত করা যায়…সেই শিক্ষা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেছিলেন—কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া…সখী দুটি শকুন্তলার সঙ্গে অঙ্গে-অঙ্গে জড়িয়ে আছেন…তবু শকুন্তলার তপোবন ত্যাগের পর

তাঁদের আর কালিদাস একেবারে নাটকে আনেন নি! তার কারণ, তাঁদের কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে। আনাড়ি লেখক হলে শকুন্তলার বিবাহের পর যখন তি।। তপোবনে আছেন পুত্র ভরতকে নিয়ে···তখন হয়তো তাঁদের আমদানি করে বসতেন! এইগুলি বুঝে উপন্যাস লিখবে। যে পাত্রপাত্রীর যতটুকু প্রয়োজন মূল কাহিনী এবং মূল পাত্রপাত্রীকে ফোটাবার জন্য···তাদের নিয়ে তার বেশী টানাটানি করা নয়। তাঁর উপদেশে আমি করেছিলুম পর-পর তিনখানি বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ···তাঁবি নির্দিষ্ট প্রণালী মেনে 'বন্দী' (ভিক্টর হুগো)···'মাতৃঋণ' এবং 'নবাব' (আলফঁশ দোদে)। মণিলাল করেছিলেন একখানি ডাচ উপন্যাসেব অনুবাদ —'ভাগ্যচক্র'; এবং সত্যেন্দ্রনাথ করেছিলেন জে।।।। লাইয়ের Soul of a Slave উপন্যাসের অনুবাদ—'জন্মদুঃখী'।

ছোট গল্প লেখার প্রসঙ্গে কত কথা হতো। মজার মজার কাহিনী বলতেন। বলেছিলেন—কুচবিহারের মহারাণীর ওখানে আমাদের মজলিশ বসতো। গান হতো···সাহিত্য-আলোচনা হতো···গল্প হতো।

কুচবিহারের মহারাণী একবার বলেন রবীন্দ্রনাথকে—আসুন, আমরা সকলে মিলে একটি গল্প লিখি। তখন রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর সমাজছাড়া একটি রোমান্সের পত্তন করেন। তিনি গল্প সুরু করলেন—দার্জিলিংয়ে ক্যালকাটা

রোডে ঘন কুজ্ঝটিকার মধ্যে একটি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক কাঁদছে। এইটুকু বলে তিনি বললেন—এবারে আপনারা এক-একজন এ-গল্পটি চালিয়ে শেষ করুন। কিন্তু কেউ গল্পকে এতটুকু অগ্রসর করতে পারলেন না! তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখলেন 'দুরাশা' গল্প। একদিন কুচবিহারের মহারাণী বললেন—আপনি নিশ্চয় ভূত দেখেছেন …একটা ভূতের গল্প বলুন। রবীন্দ্রনাথ তখন বানিয়ে একটি গল্প বলেছিলেন—অনেক রাত্রে আলিপুরের Woodlands থেকে বাড়ী ফেরবার সময়…নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের গাড়ীতে তিনি আসছিলেন…কিন্তু ময়দানে এসে নাটোরের গাড়ী ত্যাগ করে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে ওঠেন…সে-গাড়ী করে জোড়াসাঁকোয় ফিরবেন! গাড়ী চললো…রেড রোডের কাছে আসতে রবীন্দ্রনাথের মনে হলো, গাড়ীর মধ্যে তাঁর পাশে কে যেন বসে রয়েছে…তাঁর গা ঘেঁষে! তাকে ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করতে গাড়ীর মধ্যে অট্টহাসির রব। রবীন্দ্রনাথ গাড়ী থামাতে বলেন গাড়োয়ানকে…সে গাড়ী থামায় না… তারপর গাড়ীখানা ঘুরতে লাগলো চক্র দিয়ে—ভোর পর্য্যন্ত এমনি! তারপর জানা গেল, ঐ গাড়ীর মধ্যে অনেক রাত্রে একজন কেরাণীবাবু আত্মহত্যা করেছিল…সেই থেকে বেশী রাত্রে গাড়ীর মধ্যে এমনি ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটে আসছে!

গল্প শুনে কুচবিহারের মহারাণী প্রশ্ন কল্লেন—সত্যি তাই হয়েছিল ?

হেসে রবীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিলেন—মোটেই না। ভূতের গল্প শুনতে চাইলেন··বানিয়ে ভূতের গল্প বললুম।

গল্প উপন্যাস ছাড়া তিনি গান গেয়ে শোনাতেন। নতুন গান যা লিখতেন···কলকাতায় এসেই আমাদের খবর পাঠাতেন—গান শুনতে এসো। আমরা যেতুম। তিনি সে-সব গান শোনাতেন এবং গান শোনার পরে বিচিত্র জলযোগে আমাদের পরিতৃপ্ত করতেন।

আমরা আবদার করতুম—পুরোনো গানগুলিকে আপনি একেবারে ভুলে গিয়েছেন। আমরা পুরোনো গান শুনতে চাই।

আমাদের কথায় তিনি বহুকাল আগের লেখা গানও শোনাতেন। এমনি আবদার করে শুনেছিলুম কটি গান। আজো মনে আছে···গেয়েছিলেন—

তুমি যেয়ো না এখনি
এখনো আছে রজনী।

গেয়েছিলেন—

সখি, প্রতিদিন হায়,
এসে ফিরে যায় কে !
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে।

গেয়েছিলেন—

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন রে। ইত্যাদি—

এই সময়েই তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন কৃষিবিদ্যা শিখে এবং প্রত্যাগমনের পরেই রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় প্রতিমা দেবীর সঙ্গে। প্রতিমা দেবী হলেন গগনেন্দ্রনাথের ভগ্নী বিনয়নী দেবীর কন্যা।

১৯১০ সালে 'রাজা' নাটক লেখা হয়। নাটকখানি লিখে তিনি কলকাতায় এসে তাঁর গৃহে বসে পড়ে সকলকে শোনান। নূতন লেখা হলে আমাদের সকলকে ডাকিয়ে এনে সে-লেখা শোনানো—এ ছিল তাঁর রীতি। শ্রোতার আসরে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র বাগচী প্রভৃতির সঙ্গে আমরাও পেতুম আসন!

সাত

পঞ্চাশত্তম বর্ষের উৎসব : গীতাঞ্জলি : বিদেশ-ভ্রমণ : নোবেল পুরস্কার

১৩১৭ সালের ফাল্গুন মাস···কান্তিক প্রেসের আসরে বৈকালে সত্যেন্দ্র দত্ত এসে বললেন—১৩১৮ সালের বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে। তাঁর জন্মদিনে সারা দেশের লোকের প্রতিনিধি-স্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

থেকে যাতে তাঁর রীতিমত সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়, সে-ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?

এ-কথায় আমরা মেতে উঠলুম—নিশ্চয়…খুব উচিত কাজ হবে।

কিন্তু আমাদের কতটুকু সাধ্য! তাছাড়া বিরোধী যে-দলটি রবীন্দ্রনাথের নামে জলে ওঠেন…তাঁদের বেশ প্রতিপত্তি তখন দেশে। তাঁরা যদি বিরুদ্ধ সুর তোলেন… রবীন্দ্রনাথ এ-ব্যাপারের সংস্রবেও আসবেন না!

সে-কথা পরে ভেবে দেখা হবে…এখন প্রথম কর্ত্তব্য, সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী…তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ-সম্বন্ধে কথা বলা। সাহিত্য পরিষদে তখন শুধু প্রাচীন পুঁথির আদর! কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে অনেকেই পুরোনো পুঁথি নিয়ে বিভোর! রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর সঙ্গে তাঁদের মধ্যে কজনের আছে তেমন পরিচয়! আমরা তখনি কজনে (চারু বন্দ্যো, সত্যেন্দ্র দত্ত, মণিলাল গঙ্গো, বীরেন্দ্র দত্ত এবং আমি) চললুম রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে। তাঁর কাছে এ-প্রস্তাব করতে তিনি মহা-উৎসাহে বললেন—খুব উচিত কাজ…দেশশুদ্ধ সকলের তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করা উচিত। কিন্তু সাহিত্য পরিষদ কোনো জীবিত লেখকের সম্বন্ধে কিছু করেননি। আমরা বললুম—করেননি বলে করবেন না… এ কেমন কথা! বিশেষ, রবীন্দ্রনাথের মতো কবিকে।

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন—আমার খুব মত আছে। কিন্তু অনেকে আপত্তি তুলবেন···বলবেন—বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র··· তাঁরা বেঁচে থাকতে তাঁদের জন্য বাঙালী কিছু করলো না··· হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের বেলায় ?

আমরা বললুম—তাঁদের জন্য করা হয়নি···সে খুব অন্যায়···আমাদের মস্ত অপরাধ ! একবার অপরাধ করেছি, অন্যায় করেছি বলে চিরকাল তাই করবো ?

ত্রিবেদী বললেন—ঠিক কথা। এ সম্বন্ধে আমি যথাসাধ্য করবো। কিন্তু বহু টাকা চাই ··এত টাকা কোথা থেকে আসবে ? এ-কাজ তো নমো-নমো করে সারা চলে না।

আমরা বললুম—টাকার ব্যবস্থা যাতে হয়···আমরা তা করবো।

পরের দিন আমরা অনেক মাতব্বরের কাছে গেলুম। বিপক্ষ দলকে বাগানো যাবে না···কিন্তু তাঁদের মধ্যে দু-চার জন পাণ্ডা মানতেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে। হেমেন্দ্রপ্রসাদ আমাদের চেয়ে বয়সে ছ-সাত বছরের বড়। তাঁকে আমরা করগত করলুম···করে তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে আমরা গেলুম গৌরীপুরের বদান্য জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাছে। তিনি এ-ব্যাপারের জন্য অনেক টাকা দিতে রাজী হলেন··· তার পর চাঁদার খাতা খুলে ধনীদের দোরে দোরে যাওয়া।

সাহিত্য পরিষদকে রামেন্দ্রসুন্দর রাজী করালেন। স্থির হলো, এত তাড়াতাড়ি এ-উৎসব হতে পারে না…এমন শর্ট নোটিশে। তোড়জোড় করা চাই। স্থির হলো, টাকাকড়ি তোলা হোক…তারপর '৩১৮ সালেই মাঘ মাসে বেশ সমারোহে পরিষদ থেকে কবি-সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা হবে।

১৩১৮ সালের বৈশাখে ভারতী, প্রবাসী প্রভৃতি মাসিকে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো—

কবি-সম্বর্দ্ধনা

আগামী ২৫শে বৈশাখ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করিয়া ৫১ বৎসরে পড়িবেন। রবীন্দ্রবাবু আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবী। * * * তাঁহার একপঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন দেওয়া ও সম্বর্দ্ধনা করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইয়াছে। নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। সমিতি ইচ্ছা করিলে সদস্য-সংখ্যা বাড়াইতে পারিবেন।

রবীন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মানদান যাহাতে দেশব্যাপী হয়, তজ্জন্য সমিতি দেশের প্রতিভূ স্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন এবং

পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া উৎসবের দিন ও প্রণালী ধার্য্য করিবেন।

এ-জন্য সমিতি সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

এ-সমিতির সদস্য ছিলেন—মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রকুমার শীল, সারদাচরণ মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতি।

এ-বিজ্ঞাপনে জনসাধারণ তুললো বিপুল সাড়া। অনেক টাকা আসতে লাগলো এবং পরে সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করে পরিষদ জানালেন—কলিকাতা টাউন হলে ১৩১৮ সালের ১৪ই মাঘ…১৯১২ সালের ২৮শে জানুয়ারি রবিবার হবে কবি রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা।

বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো—

কবি সম্বর্দ্ধনা

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা ও অভিনন্দন।

স্থান : টাউন হল, কলিকাতা।

সময় : ১৪ই মাঘ, ১৩১৮—২৮শে জানুয়ারি, ১৯১২, রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা।

সভাপতি : শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম-এ, বি-এল
(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি)

নিবেদন : কবিবর সভা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে অনুগ্রহ করিয়া কেহ আসন পরিত্যাগ করিবেন না।

তার পর যথাস্থানে যথাসময়ে উৎসব। অত বড় টাউন হল …লোকে একেবারে লোকারণ্য—রাজার রাজ্যাভিষেক যেন! রবীন্দ্রনাথ যখন সভাস্থলে প্রবেশ করলেন, জনারণ্য থেকে বিপুল হর্ষোল্লাস…করতালির কি সমারোহ! রবীন্দ্রনাথ এলেন যেন সম্রাট!

সভাপতি করলেন সভার উদ্বোধন। তারপর পরিষদের সম্পাদক সুধীবর রামেন্দ্রসুন্দর জানালেন—এবার মঙ্গলাচরণ হবে। পণ্ডিত ঠাকুরচরণ আচার্য্য উপনিষদ থেকে শ্লোক পাঠ করে কবিকে করলেন আশীর্ব্বাদ…তারপর গান। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তাঁর সম্প্রদায় গাইলেন গান। গানটি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর লেখা। গানটি হলো—

বাণীবরতনয় আজি স্বাগত সভামাঝে
অযুচিত-কমলে যেথা আসন তব রাজে।

এ-গানের পর পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে কবিকে করলেন আশীর্ব্বাদ। এ-আশীর্ব্বাদের পর কবিবন্ধু নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় করলেন অর্ঘ্যদান—রূপার বড় পাত্রে নানা খোপে ধান, দূর্বা, খই,

চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, দই, ঘী, মধু—মাঙ্গল্য দ্রব্য। অর্ঘ্য দিয়ে নাটোর কিছু বললেন; তার পর সভাপতি পরালেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য···সেই সঙ্গে দিলেন সোনার তৈরী একটি পদ্ম। পদ্মটিতে কাশ্মীরি-নক্সার চমৎকার কাজ!

এ-সবের পর রামেন্দ্রসুন্দর পড়লেন অভিনন্দন···দিলেন মানপত্র। রামেন্দ্রসুন্দরের গম্ভীর কণ্ঠে অভিনন্দন শোনালো মন্ত্রের মতো!

তার পর স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা দিলেন—বৃদ্ধবয়সে কি আবেগে ভরা তাঁব কণ্ঠ! তিনি যা বললেন, তা যেমন ভাবোচ্ছ্বসিত·· তেমনি তাঁর সে-কথায় কি গভীর রসাত্মবোধকতা! রবীন্দ্রনাথের ছোট বয়সেব লেখা বাল্মীকি প্রতিভার কথা তুলে স্যর গুরুদাস বললেন—কবি ছোট বয়সে লিখেছেন, বাণীদেবী বাল্মীকির উপর তুষ্ট হয়ে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করে বলছেন—

> যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়···
> শত স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময়।
> সে জাহ্নবী বহিবে অযুত হৃদয় দিয়া—
> শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি বিদরিয়া।

শুধু এ-কথা বলা নয়···রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে নিজের লেখা একটি গানও তিনি পড়ে শোনালেন। তাঁর লেখা সে-গানের কথা কতখানি সত্য···রবীন্দ্রনাথের রচনা যাঁরা বোঝেন,

তাঁরা তা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করবেন। স্যর গুরুদাসের লেখা সে-গানটি আগাগোড়া উদ্ধৃত করছি—

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর···
অজ্ঞান-তিমিরে তব সুপ্রভাত হেলো হের!
উঠিছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি
নব 'বাল্মীকি প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।
হের তাহে প্রাণভরে ক্ষুধা-তৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
মণিময় ধূলিবালি খোঁজো যাহা দিবানিশি—
সভাবে মজিবে মন খুঁজিতে যাবে না আর।

সর্ব্বশেষে আমরা দিলুম তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি। সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ একটি গান লিখেছিলেন···সেটি পড়া হয়নি···কিন্তু চমৎকার সে গান—

কীর্ত্তিগগনসূর্য্য হে
বঙ্গভুবনপুজ্য হে
প্রতিভা তোমার
করিল প্রচার
আঁধারে যা ছিল উহ্য হে
পূজ্য হে।

অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে উত্তর দিয়েছিলেন··· ভাবে-ভাষায় এবং বিনয়-নম্রতায় তা অনবদ্য!

গীতাঞ্জলি : নোবেল পুরস্কার

১৯১২ সালেই তিনি ওভারটুন হলে 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধ পড়েন। ঐ-প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষে নানা জাতি, নানা ধর্ম্ম এসে পাশা-পাশি বয়ে চলেছে—বিরোধ-দ্বন্দ্ব যে হয়নি তা নয়···কিন্তু তাতেও ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের গভর্ণমেণ্ট গোপন পত্র দিয়ে সরকারী কর্ম্মচারীদের নিষেধাজ্ঞা জারি করে—ছেলেমেয়েদের কেউ শান্তি-নিকেতনে পড়তে বা থাকতে পাঠাবেন না। ওখানে রাজবিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত করা হয়। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের যখন এই ফতোয়া জারি হচ্ছে···তখন শান্তি-নিকেতনে প্রতিষ্ঠাপন্ন এক মার্কিন আইনজীবী এসে কিছুকাল থেকে সেখানকার শিক্ষা-প্রণালী প্রভৃতির অজস্র স্তুতি করে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল হয়েছিলেন য়ুরোপে যাবার জন্য—সেখানে গিয়ে নানা দেশে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে · ছেলেমেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলবার জন্য কি সব ব্যবস্থা সেখানে—এ-সব দেখে শুনে শান্তিনিকেতনে সর্ব্বশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করবেন। 'গীতাঞ্জলি'র কবিতাগুলি ইতিমধ্যে ইংরেজীতে নিজে অনুবাদ করেছিলেন। তারপর ১৯১২ সালের ২৭শে মে তারিখে পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে নিয়ে তিনি য়ুরোপ যাত্রা করলেন। তাঁর য়ুরোপ যাত্রা এই প্রথম নয়···পূর্ব্বেও কিশোর বয়সে তিনি য়ুরোপে গিয়েছিলেন।

১২ জুন তিনি লণ্ডনে পৌঁছুলেন। হোটেলে আশ্রয় এবং এখানে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলো প্রসিদ্ধ শিল্পী রদেনষ্টাইনের সঙ্গে। কলকাতাতেই রদেনষ্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল, রদেনষ্টাইন ভারত-ভ্রমণে এসে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন রদেনষ্টাইনকে গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ। রদেনষ্টাইন বিমুগ্ধ হয়ে তার টাইপ কাপি করিয়ে সে-অনুবাদ দেখান কবি ইয়েট্স, ষ্টপফোর্ড ব্রুক এবং ব্রাডলিকে। পড়ে সকলেই মুগ্ধ। তারপর রদেনষ্টাইন নিজের গৃহে এক সাহিত্যিক আসর ডাকালেন এবং এ আসরে মে সিনক্লেয়ার, এভলিন আণ্ডারহিল, আর্নেষ্ট রীশ, পলসি ট্রেভলিয়ান, এজরা পাউণ্ড প্রভৃতির সামনে রবীন্দ্রনাথ নিজে পড়লেন সে-অনুবাদ।

বিলাত যাবার সময় এখানে তাঁর গ্রন্থাদির প্রকাশ এবং বিক্রয়াদির পর্য্যালোচনা-ভার রবীন্দ্রনাথ দিয়ে যান বন্ধু মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে। রবীন্দ্রনাথ যখন বিলাতে, তখন এখানে তাঁর কটি ছোট গল্পের নাট্যরূপায়ণ চললো কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে। ১৯১১ সালে আমি তাঁর 'মুক্তির উপায়' গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছিলুম—'দশচক্র' নামে তার অভিনয় বেশ জমেছিল। তাই দেখে ষ্টার থিয়েটারের অমরেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের আরো দুটি গল্প নাট্যরূপায়িত করে মঞ্চস্থ করেন।

সে-নাট্যরূপায়ণে গল্পের চরিত্রগুলি বিকৃতি লাভ করে। তখন কপিরাইট নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতেন না…কাজেই রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নেবার কথা থিয়েটার-কর্তৃপক্ষ চিন্তাও করেননি। কিন্তু গল্পের বিকৃতি ঘটার জন্য মণিলাল সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এটর্ণি মিত্র এ্যাণ্ড সর্ব্বাধিকারীর ফার্ম থেকে নোটিশ দিয়ে সে-অভিনয় বন্ধ করিয়েছিলেন।

বিলাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেখানকার সাহিত্যরথীদের হয় অন্তরঙ্গতা—বার্ণার্ড শ, ওয়েল্‌শ., মেশফীল্ড, গল্‌স্‌ওয়ার্দি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিলাত থেকে দেশে ফিরে তিনি কেনেন সুরুল গ্রামে… শান্তিনিকেতন থেকে তিন মাইল দূরে…নীলকুঠির এক বাঙলো এবং তৎসংলগ্ন ক' বিঘা জমি এবং এখানে তিনি বিশ্বভারতীর পল্লীসংস্কার-বিভাগের কেন্দ্র স্থাপনা করেন।

তার পর কিন্তু স্থির থাকতে পারলেন না! ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসের শেষাশেষি তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। আমেরিকাতেও তাঁর সম্মান-সমাদরে সমারোহ ঘটে। সেখানে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং চাপেলে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতার সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমেরিকা-যাত্রায় তাঁর সাথী হয়েছিলেন ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। সেখানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কটি বক্তৃতা দেন; সে

বক্তৃতাগুলি প্রবন্ধাকারে 'সাধনা' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে এবং এই সময়েই বিলেতের ম্যাকমিলান কোম্পানি তাঁর গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রকাশ করেন চিত্রাঙ্গদা এবং চিত্রার ইংরেজী অনুবাদ।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে ফেরেন ১৯১৩ সালের ৪ অক্টোবর তারিখে। বিলাতে তিনি যে-সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন··· সেগুলির সম্বন্ধে বিখ্যাত সুধী-সমালোচক আর্নেষ্ট রীশ তাঁর রচিত রবীন্দ্রনাথের জীবনী-গ্রন্থে যা লিখেছেন, তার মর্ম্মার্থ—

শ্রোতার দল তাঁর বক্তৃতা শুনে বিমুগ্ধ হলেন। তাঁর বাগ্মিতা অসাধারণ···কণ্ঠের স্বর সুস্পষ্ট এবং সে-স্বরে ভাবের আবেগ মন্দ্রিত হয়ে শ্রোতার মনকে আবিষ্ট করে তোলে। প্রাচ্য-জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি নিজের জ্ঞানের আলোয় এমন উজ্জ্বল দীপ্ত করে তিনি দেখাচ্ছেন যে সারা লণ্ডন কেন, সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ তাতে মন্ত্রমুগ্ধ!

এই ১৯১৩ সালেই ১৩ই নভেম্বর তারিখে খবর এলো—সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখন দেশে যাঁরা ছিলেন রবীন্দ্র-বিদ্বেষী···তাঁরা বলতেন, বড়লোকের ছেলে···ইয়ার্কি না দিয়ে লেখা নিয়ে থাকেন···পাঁচজনে বাহবা দেয়···তাঁরা অবাক! বিলাত যে-জিনিষকে বলে, খাশা···তাঁরা নির্বিচারে তাকে 'খাশা' বলে মানেন—এই ছিল তখনকার দিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাপমারা তথাকথিত পণ্ডিতদের শতকরা নব্বইজনের পরিচয়। তাঁরাও ধন্য-ধন্য করলেন এবং জনসাধারণ তখন এ-গৌরবে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন করতে শান্তিনিকেতনে গেলেন ২৩শে নভেম্বর ১৯১৩ এবং সে-সভায় রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানালে রবীন্দ্রনাথ অভিমানভরে যে কথা বলেছিলেন···সেই কথা নিয়েই আমাদের এ-বক্তব্য সুরু করেছি···সুতরাং তার পুনরুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তিতে বিরোধীদলের কটূক্তি চলেছিল কিছুকাল···নানা কাগজের নানা লেখায়। এ-বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পাল Hindu Review পত্রিকায় যা লিখেছিলেন তার মর্ম্মার্থ—

তিনি জানতেন, যাঁরা অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর লেখা পড়েছেন কি না সন্দেহ! তাঁর রচনাকে এঁরা সাহিত্যের মর্যাদাও দেননি কোনোদিন। তাই তাঁদের উদ্দেশ করেই তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেছিলেন—এতকাল আমার রচনা আপনাদের তৃপ্তি দিতে পারলো না··· আর এখন বিদেশীর কাছে রচনার জন্য সম্মান লাভ করবামাত্র আপনারা আমার স্তুতি করতে এলেন!

রবীন্দ্রনাথ এ-পুরস্কার-প্রাপ্তির পর রদেনষ্টাইনকে পত্র লিখেছিলেন···১৯১৩···১৮ই নভেম্বর। তাতে তিনি লিখেছিলেন—The perfect Whirl-wind of public excitement it has given rise to is frightful···Really

these people honour in me and not myself.

এই সময়েই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাজে রামশে মাকডোনাল্ড এসেছিলেন ভারতবর্ষে। তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন…আলাপ-আলোচনা করেন। মাকডোনাল্ড সাহেব তার বিবরণ লিখে বিলাতের Daily Chronicle পত্রে পরে ১৯১৪…১৪ই জানুয়ারি প্রকাশ করেন।

এই বছরেই…ভারতের বড়লাট তখন লর্ড কার্মাইকেল …কলকাতার গভর্ণমেণ্ট হাউসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কনভোকেশন অনুষ্ঠিত করে রবীন্দ্রনাথকে (অনারারি) ডি-লিট উপাধিতে সম্মানিত করেন। তাঁর সঙ্গে প্রোফেশর ভিনোগ্রাদফ, হর্ম্মান জেকবি এবং সিলভাঁ লেভিকেও ঐ সম্মানে ভূষিত করা হয়। এঁরা তিনজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এ-সম্মান-দানের প্রস্তাব অবশ্য মঞ্জুর হয়েছিল তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ বেরুবার পূর্ব্বেই। এ-প্রস্তাব হয়েছিল বাঙলার অদ্বিতীয় কৃতী সন্তান চির গুণগ্রাহী স্যর আশুতোষের দ্বারা। তিনি তখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর এবং বড়লাট চান্সেলর।

উপাধি-দানের সময়…যাঁকে উপাধি দেওয়া হচ্ছে…তাঁর

পরিচয় দেওয়া রীতি···সেই রীতি-অনুযায়ী স্যর আশুতোষ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরিচয় লাট-চান্সেলরের কাছে। পরিচয়-প্রসঙ্গে স্যর আশুতোষ যা বলেছিলেন, তার মর্ম্মার্থ এখানে উদ্ধৃত করে দিলুম—

আমাদের জাতীয় কবি, আমাদের গৌরব, গর্ব্ব এবং আনন্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শুধু বাঙলা-সাহিত্যেই সকলের উর্দ্ধে তাঁর আসন নয়···পৃথিবীর জীবিত কবি-সমাজেও পুরোভাগে তাঁর আসন। কিন্তু কবি, নাট্যকার বা সন্দর্ভ-কবি হিসাবে তাঁর কতখানি বৈশিষ্ট্য···তার হিসাব না করেও এ-কথা সকলেই নিঃসংশয়ে স্বীকার করবেন যে, তাঁর রচনায় কল্পনার বৈচিত্র্য এবং মাধুর্য্য, জাতীয়তা এবং অধ্যাত্ম-তত্ত্বের যে বৈশিষ্ট্য আছে, দেশকাল সমাজ-নির্ব্বিশেষে সকল সুধীজনের তা চিত্ত-বিনোদন করে।

উপাধি দেবার সময় লর্ড কারমাইকেল যা বলেছিলেন, তার মর্ম্মার্থও এখানে দেওয়া হলো—

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আদর এবং সম্মান যে বিশ্ববিশ্রুত, তার নিদর্শনস্বরূপ এই নোবেল পুরস্কারের বিজয়মাল্য কবির হাতে দেবার জন্য তাঁকে তাঁর বিরাম-কুঞ্জ থেকে টেনে এনে যে অপরাধ করলুম, তার জন্য মার্জ্জনা চেয়ে বলছি, প্রতিভার জন্য এ-দণ্ড তাঁকে গ্রহণ করতেই হবে—উপায় নেই।

এই সভাতেই লর্ড কারমাইকেল দেন রবীন্দ্রনাথের হাতে নোবেল পুরস্কার এবং পদক।

১৩২১ সালের ১লা বৈশাখ…স্কুলে রবীন্দ্রনাথ করেন শিল্পকারু শিক্ষাসদন এবং লাবরেটরি ও লাইব্রেরী। এ উৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয় তাঁর নাটক অচলায়তন! অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

আট

সবুজপত্র : বিদেশ-ভ্রমণ : বিচিত্রার আসর

১৯১৪ সাল।

কান্তিক প্রেসে মণিলাল, চারুচন্দ্র, সত্যেন্দ্র দত্ত, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে জমায়েত হই…মাঝে মাঝে আসরে আসেন দ্বিজেন্দ্র-নারায়ণ বাগচী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী। আসরে নিজেদের রচনা পড়ি, সাহিত্যালোচনা করি…রাত নটা নাগাদ আসর ভাঙ্গে ; তখন যে-যার গৃহে ফিরি। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থাকেন…মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন…তিনি কলকাতায় এলেই আমরা খবর পাই…তাঁর কাছে যাই। লেখা নিয়ে আলোচনা চলে—তাছাড়া অবনীন্দ্রনাথের গৃহে প্রকাণ্ড লাইব্রেরী…বিলাতী বই আসে প্রতি হপ্তায় ভারে ভারে…নানা

বিষয়ের বই—আমরা কজন বন্ধু সে-সব বই বাড়ীতে আনি··· এনে পড়ি এবং এ-সব বই পড়ে আমাদের চলে নানা আলোচনা।

মাঘোৎসবের কদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে আমরা তাঁকে ধরে 'ভারতী'র সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করতে বলি। কেন না, স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় স্বর্ণকুমারী দেবী অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। তিনি 'ভারতী'র সম্পাদনা ত্যাগ করতে চাইছিলেন—তাই মণিলাল এবং আমি বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে ধরলুম··· ভারতীর ভার নেবার জন্য। তিনি রাজী হলেন না। তিনি বললেন—সাহিত্যে যে ব্যাপার চলেছে···ইচ্ছা হয়, এখনকার তরুণদলের জন্য একবার মাসিকের কাজ করি; কিন্তু জানো তো, আমার এখন অনেক কাজ···সম্পাদকী করতে হলে কাগজ নিয়ে থাকতে হবে। সে-কাজ আমার দ্বারা বেশী দিন চলে না। কতবার সম্পাদকীর হাল ধরেছি তো··· কিন্তু হাল ধরে বেশী দিন থাকতে পারিনি কখনো। মণিলাল বলেন, নতুন কাগজই বার করুন···একেবারে নতুন··আপনার মনের মতন করে লিখুন একালের উপযোগী লেখা। প্রমথ চৌধুরীকে ধরে সম্পাদক করবো, আমার কান্তিক প্রেসে ছাপা হবে, আমি এদিককার ভার নেবো···ছাপানো, পয়সাকড়ির হিসাব···সেদিকে আপনাকে দেখতে হবে না, প্রমথবাবুকেও না।

তারপর প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্ত্তা হয় এবং স্থির হয়, সামনের বছর থেকে নতুন কাগজ বেরুবে। প্রমথ চৌধুরী হবেন তার সম্পাদক…মণিলাল করবেন দেখাশুনা। পত্রিকার নাম স্থির হলো সবুজপত্র এবং সবুজ-পত্র বেরুলো ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে…কান্তিক প্রেসে ছাপা। এই হলো সবুজপত্রের ইতিহাস।

এ-সময়ে চিত্তরঞ্জন বার করলেন বাঙলা মাসিকপত্র—'নারায়ণ'। নারায়ণ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের উপর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণ সুরু হলো। কিন্তু তার পূর্ব্বে আর একটি ঘটনার কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। সে ঘটনার কথা বলি—

১৯১২ সালের নভেম্বর মাস—বাঙলা থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্র-লালের নাটকের খুব পশার। ষ্টার থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তখন কর্ত্তা। দেড় হাজার টাকা রয়েলটী দিয়ে তিনি নিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' নাটক-অভিনয়ের স্বত্ব। 'পরপারে'র পর দ্বিজেন্দ্রলাল দিলেন অমরেন্দ্রনাথের হাতে একখানি চুটকি রঙ্গনাট্য—'আনন্দ বিদায়'। রবীন্দ্রনাথকে হেয়ভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে 'আনন্দ বিদায়' লেখা। রবীন্দ্র-নাথের এত সম্মান…বিরোধী দলের আক্রোশ তখন আরো বেড়েছে। থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের খুব পশার—অতএব থিয়েটার থেকে আক্রমণ করা যাক। এই উদ্দেশ্যেই তাঁর অনুচরবৃন্দ তাঁকে তাতিয়ে এ-বই লিখিয়ে তার অভিনয়ের

ব্যবস্থা করালেন। নাটিকাখানিকে তিনি অভিহিত করলেন চাঁটিকা বা parody play বলে। যথা-সময়ে অভিনয় স্থুরু হলো···কিন্তু একটি দৃশ্য শেষ হতে না হতে দর্শকের দল ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার তুললেন—বন্ধ করো বই·· রবীন্দ্রনাথকে কদর্য্যভাবে আক্রমণ···তাঁর অমর্য্যাদা করা! দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে রয়েল বক্সে বসে অভিনয় দেখছিলেন। দর্শকের দল তাঁকে শুধু যা-তা কটূক্তি করলো না···নীচে থেকে একপাটি জুতাও তাঁকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। থিয়েটার-কর্ত্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি পর্দ্দা ফেলে অভিনয় বন্ধ করেন। দর্শকরা চীৎকার করতে লাগলো—রবীন্দ্রনাথকে এমন আক্রমণ করো! এমন স্পর্দ্ধা···দেবো এর সাজা!

দ্বিজেন্দ্রলাল এ-ব্যাপারে মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন এবং ক্রুদ্ধ দর্শকদল পাছে থিয়েটার থেকে বেরুবার সময় তাঁকে আক্রমণ করে, সেজন্য বন্ধ সেকণ্ড-ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ীতে তাঁকে ষ্টেজের ওদিক দিয়ে ষ্টার লেনের পথে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া হয়।

'নারায়ণ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের উপর ক' সংখ্যায় বেশ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চলেছিল। 'সবুজপত্রে' রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি প্রকাশ হবার পর এ-ব্যঙ্গ স্থুরু এবং এ-গল্পটিকে ব্যঙ্গ করে (carricature) বিপিনচন্দ্র পাল লিখে ছাপালেন

একটি গল্প—সে গল্পের নাম 'মৃণালের পত্র'। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ কটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'বাস্তব' এবং 'লোকহিত' সম্বন্ধে। তাতে তিনি খেদ জানিয়েছিলেন এই যে, জনগণের দারিদ্র্য-দুঃখ-মোচন এবং সামাজিক মর্যাদা দানের ব্রত নিয়ে মানুষ সে সম্বন্ধে দেশের মানুষকে উর্দ্ধে তোলবার কোনো প্রয়াস পাননি।

এসব নিয়ে আমাদের আলোচনা চলতো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এবং সে-সব আলোচনা তিনি অনেক সময় প্রবন্ধাকারে লিখতেন। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তব্য নিয়ে তিনি যে সব কথা বলেছিলেন…তা তিনি পরে প্রবন্ধ লিখে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সে-সব কথা নানা রচনা থেকে উদ্ধৃত করে দিলুম।

তিনি বলেছেন—পরিণাম না জেনে আমি একটির পর একটি কবিতা যোজনা করে এসেছি। তাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করেছিলুম…আজ সমগ্রের সাহায্যে বুঝি, সে অর্থ অতিক্রম করে একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য্য তাদের প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল।

বলেছিলেন—বিশ্ববিধির নিয়ম দেখি, যেটা আসন্ন…যেটা উপস্থিত, তাকে সে রোধ করতে দেয় না…তাকে জানতে দেয় না যে সে একটা সোপান-পরম্পরার অঙ্গ। তাকে বুঝিয়ে দেয় যে সে আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত। ফুল যখন

ফুটে ওঠে, তখন মনে হয়, ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য! কিন্তু সে যে ফল ফলাবার উপলক্ষ মাত্র, সে-কথা গোপনে থাকে। বর্ত্তমানের গৌরবেই সে প্রফুল্ল, ভবিষ্যৎ তাকে অভিভূত করে না। কাব্য-রচনা সম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখি।

বলতেন—শুধু কবিতা লেখার কথা নয়···আমাদের জীবনের দিকে চেয়ে ছাখো—প্রত্যেকের জীবন যে গড়ে উঠছে, তার সমস্ত সুখ-দুঃখ, তার সমস্ত যোগ-বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে একজন যেন একটি অখণ্ড তাৎপর্য্যের মধ্যে গেঁথে তুলছেন। আমার সমস্ত বাধাবিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি যেন নিজে গেঁথে জুড়ে দাঁড় করাচ্ছেন। সেইজন্য এই পৃথিবীর তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করতে পারি··· সেইজন্যই এত বড় রহস্যময় প্রকাণ্ড পৃথিবীকে অনাত্মীয় বা ভীষণ মনে হয় না।

তাঁর লেখায় 'জীবন-দেবতা'র উল্লেখ সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন করেছিলুম—এ জীবন-দেবতার অর্থ কি?

তিনি বলেছিলেন—এ সম্বন্ধে আমি একবার কাকে এক পত্র লিখেছিলুম···তাতে লিখেছিলুম, আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজন-শক্তি···সে-শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখকে, সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান করেছে, তাৎপর্য্য দান করেছে···

যার মধ্য দিয়ে বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করেছি··· তাকেই আমি 'জীবন-দেবতা' নাম দিয়ে একবার লিখেছিলুম—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম!
দুঃখ-সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরে দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি রস
দলিত দ্রাক্ষাসম।

এ সম্বন্ধে তাঁর যা বক্তব্য···তা তিনি লিখেছিলেন 'আত্মচরিতে'। এটি লেখা হয় ১৩১. সালে। তিনি লিখেছিলেন—

বালককালে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিয়াছিলাম। তখন আমি নিজে ভালো করিয়া বুঝিয়াছিলাম কি না জানি না··· কিন্তু তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করি। * * * পরিণত বয়সে যখন 'মালিনী' লিখি···তখনো দূর হইতে নিকটে, অনির্দ্দিষ্ট হইতে নিকটে, কল্পনা হইতে প্রত্যক্ষের মধ্যেই ধর্ম্মকে উপলব্ধি করিবার কথা বলিয়াছি! যাঁরা বলেন, আমি

কল্পনাবিলাসী···বাস্তবের সঙ্গে সর্ব্বসংস্পর্শহারা···বুঝি না, তাঁরা কেন এ-কথা বলেন ! আসলে আমি কল্পনাবিলাসী নই।

১৯১৫ সালের গোড়ায় 'বলাকা' প্রকাশিত হয় এবং এই বছরে মহাত্মা গান্ধি (তখন সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাগত) তাঁর Phoenix School-এর ছাত্রদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হলো না···তিনি বিলাত থেকে ফিরে তখন বোম্বাইয়ে আটকে পড়েছেন। তিনি যখন শান্তিনিকেতনে এলেন··· মহাত্মা গান্ধি তখন সস্ত্রীক শান্তিনিকেতন দেখে সেখান থেকে প্রস্থান করেছেন। ছাত্রেরা ছিলেন শান্তিনিকেতনে। পূর্ব্ববঙ্গের পাট-চাষীদের দুর্দ্দশামোচনকল্পে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা তখন নিজেদের খাবারের খরচ বাঁচিয়ে পয়সা বাঁচিয়ে সে-পয়সা সেখানে পাঠাবার সঙ্কল্প করেন। রবীন্দ্রনাথ জানতে পেরে তাঁদের বলেন—এতে দুর্দ্দশা ঘোচানো যাবে না···পয়সা উপার্জ্জন করা চাই কায়িক পরিশ্রমের কাজ করে।

এখানে ফিরে তিনি 'ফাল্গুনী' রচনা করলেন এবং ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে গান্ধিজীর ছাত্রেরা সে-অভিনয় দেখলেন। তার পর মহাত্মা হরিদ্বার থেকে শান্তিনিকেতনে আবার এলেন ছাত্রদের নিয়ে যাবার জন্য। তখন দুজনে শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা করে স্থির হয়, ছাত্রছাত্রীদের স্বাবলম্বী

করে তুলতে হলে কোনো বিষয়ে পরমুখাপেক্ষিতা নয়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সে-ব্যবস্থা দেখে মহাত্মা খুব তৃপ্তি লাভ করেছিলেন এবং তাঁকে 'গুরুদেব' বলে প্রণাম করে চলেন।

১৯১৫ সালের জুন মাসে ভারত-সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজ-সরকার 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। এবং রবীন্দ্রনাথ তার পর যান কাশ্মীর—কাশ্মীরে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কাশ্মীর থেকে তিনি ফেরেন কলকাতায়···ফিরে রামমোহন লাই ব্রেরীতে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাতে তিনি বহু যুক্তি দিয়ে বাঙলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা-প্রচলনের সমর্থন করেন। এই বছর ১৬ই জানুয়ারি ১৯১৬ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে মহাসমারোহে হয় 'ফাল্গুনী'র অভিনয়। এ-অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিশেখর এবং অন্ধ বৃদ্ধ বাউল···দুটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে অভিনয়ের স্মৃতি আজো মনে প্রদীপ্ত রয়েছে! কি অপূর্ব তাঁর অভিনয়··· কি অপরূপ মেক-আপ! কার সাধ্য বোঝে, একই ব্যক্তি দুটি বিপরীতমুখী বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন!

১৯১৬ সালে জাপান যাত্রা। সেখানে কি সম্বর্দ্ধনা! কি সমাদর! প্রসিদ্ধ জাপানী চিত্রশিল্পী হারার আতিথ্য

গ্রহণ করেছিলেন। সেখান থেকে নিমন্ত্রণ পান কানাডার ভাঙ্কুরায় যাবার জন্য···কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতীয়দের উপর তখন চলেছে নিপীড়ন···নির্য্যাতন···সেজন্য এ-নিমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

জাপান থেকে রবীন্দ্রনাথ যান আমেরিকায়···ওয়াশিংটনে। সেখানে লেকচার টুরের জন্য কনট্রাক্ট হয়। আমেরিকার প্রসিদ্ধ লেকচার ব্যুরো···পণ্ড লেকচার বুরোর জে, পণ্ডের সঙ্গে হয় কনট্রাক্ট এবং ইউনাইটেড ষ্টেটসের বহু সভা-সমিতিতে, ক্লাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বক্তৃতা তিনি দান করেন। শীটল ক্লাবের মহিলাদের আমন্ত্রণে সে-ক্লাবেও তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়। আমেরিকায় তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল—'জাতীয়তার ধর্ম্ম'। তাতে তিনি পাশ্চাত্য ইমপীরিয়ালিজ্‌মের কঠিন সমালোচনা করেন এবং ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের নিন্দা করেন। এ-বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন—পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতিকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হতে—পৃথিবীতে সকলে এক জাতি···ধর্ম্ম বা বর্ণের বৈষম্য থাকবে না। এজন্য সেখানকার কখানা সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বেশ কঠিন মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। নিউ-ইয়র্কের কলাম্বিয়া থিয়েটারে তাঁকে একটি গল্প পড়ে শোনাতে হয়, এবং 'রাজা'র ইংরেজী তর্জ্জমা করে সে অনুবাদও কতক কতক পড়ে শোনাতে হয়েছিল। ভারতের বিপ্লবীদলের সর্দ্দার রামচন্দর···এক শিখ ভদ্রলোক···সেখানে

তাঁর বাস। তিনি সেখানকার সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে প্রবন্ধ লিখে ছাপিয়েছিলেন। রামচন্দর সর্দ্দার লিখেছিলেন যে, কবি sailing under false colours by retaining the privilege of British Knighthood and airing anti-British views বলে। গুজব রটেছিল যে সর্দ্দারের পার্টি রবীন্দ্রনাথকে হত্যা করবে। এ-গুজবের ফলে সেখানকার কর্তৃপক্ষ পুলিশ-প্রহরী দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে উদ্যত হলে রবীন্দ্রনাথই তাঁদের নিষেধ করেন। রামচন্দর এ-গুজব মিথ্যা বলে পোর্টল্যাণ্ড টেলিগ্রাম পত্রে বিজ্ঞপ্তি দেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেন—না, কবির প্রাণহানির কোনো আশঙ্কা নেই···তবে কবি যেন এখানে দীর্ঘকাল না থাকেন! সে কথায় রবীন্দ্রনাথ ভ্রূক্ষেপমাত্র করেননি। তিনি আরো বহু স্থানে—নিউ-ইয়র্কের কার্নেগি হল এবং ফিলাডেলফিয়ায় মাউণ্ট হোলিয়োক কলেজে আর্ট, জাতীয়তা প্রভৃতি নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমেরিকা প্রদক্ষিণ করে তিনি কলকাতায় ফেরেন ১৯১৭ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে।

কলকাতায় এসে তিনি একটি মিলনী-আসরের ব্যবস্থা করলেন—এ-আসরের নাম দিলেন 'বিচিত্রা'। এ-আসর নিত্য বসবে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে, তিনি বসবেন অধিনায়ক হয়ে। তিনি যখন কলকাতায় থাকবেন না···তখন তাঁর

আসন নেবেন গগনেন্দ্রনাথ কিম্বা অবনীন্দ্রনাথ। এ-আসরে আমরা সদলে যোগ দিলুম সদস্য হয়ে—প্রবেশিকা-ফী এক টাকা এবং মাসিক চাঁদার হার এক টাকা করে। নিত্যকার আসরে আমরা বসে রচনাদি পড়তুম। বিশেষ আসর বসতো মাঝে মাঝে···রবীন্দ্রনাথ সে-আসরে তাঁর নূতন লেখা পড়তেন—কবিতা গল্প নাটিকা প্রবন্ধ। এ-আসরে সাহিত্য-রসিক বহু প্রবীণ এবং তরুণ যোগ দিলেন সদস্য হয়ে। বিচিত্রার আসরে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই দুটি গল্প পড়েছিলেন··· তপস্বিনী এবং পয়লা নম্বর। আসরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বাঙলা ভাষার অনুশীলন, বাঙলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন। আসরে রবীন্দ্রনাথ গান গেয়ে শোনাতেন···তাঁর সুরভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ গান গেয়ে শোনাতেন···অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী গান গেয়ে শোনাতেন। অনেক পুরোনো গান আমাদের কথায় রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, এবং অজিতকুমার শুনিয়েছিলেন। আসরে হাসি-গল্প-কৌতুক চলতো অবাধে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গে মিশতেন সমবয়সী বন্ধুর মতো। রবীন্দ্রনাথ তখন মোটরের ব্যবসায় নেমেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গগনেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র কনকেন্দ্রনাথ এবং সমরেন্দ্রনাথের পুত্র স্বরিন্দ্রনাথ (ন্যাদোশ)। এ-আসরের কটি কৌতুক-কাহিনী বলি :

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নূতন একটি গানে সুর দিয়ে কলকে

শোনালেন···দিনেন্দ্রনাথ তাঁর সে-সুরে একটু অদলবদল করে সেই সুর শুনিয়ে বললেন—ওখানটা বদলে এমনি সুর দিন।
রবীন্দ্রনাথ শুনলেন···ভাবলেন···তার পর বললেন—না!

ব্যাপার কিন্তু এইখানেই চুকলো না। দিনেন্দ্রনাথ নিজের সুরটি গুণগুণ করে ভাজেন প্রায় সর্ব্বক্ষণ। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের গৃহের দোতলায় বড় হলঘরে···ঘর-জোড়া জাজিম পাতা···আসনে সকলে বসেছি···রবীন্দ্রনাথ পুরানো দিনের গল্প বলছেন এবং ঘরের সামনে দক্ষিণ দিকের প্রশস্ত বারান্দায় দিনেন্দ্রনাথ পায়চারি করছেন···কণ্ঠে গুণগুণ করে গান গাইছেন। রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ কথা বন্ধ করে ইঙ্গিতে আমাদের নির্দ্দেশ দিলেন—চুপ করে বসে থাকতে। আমরা অবাক! চুপ করেছি···রবীন্দ্রনাথ উঠলেন···উঠে ঘরের দরজার কাছে এসে ডাকলেন—দিনু···

দিনু বললেন—আজ্ঞে!

রবীন্দ্রনাথ বললেন—আমাদের দেশে কথা আছে, কাজ না থাকলে মানুষ বুড়ো খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করে···জানো তো এ-কথা?

দিনেন্দ্রনাথ স্তব্ধ-বিস্ময়ে বললেন—জানি।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—আমার বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েছে কাজেই বুড়ো হয়েছি। তোমার খুড়ো নই—তবু তুমি আমায় গঙ্গাযাত্রা করাতে চাও!

এ কি হেঁয়ালি! আমরা কেউ কিছু বুঝছি না। রবীন্দ্রনাথ বললেন—আমার ও-গানে তোমার ঐ সুর…ও-সুর আমায় শোনানোর অর্থ আমাকে হত্যা করা। তোমার কোনো কাজ না থাকে…যাও, গড়ের মাঠে গিয়ে হাওয়া খেয়ে এসো। ও-সুর আমায় শুনিয়ে কেন আমার গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ করছো!

কথা শুনে আমরা হেসে ফেটে পড়বার জো! দিনেন্দ্রনাথ দারুণ অপ্রতিভ হয়ে নিঃশব্দে বারান্দা থেকে সরে গেলেন!

আর একদিনের কথা!

আমি তখন ল পাশ করে ওকালতি সুরু করেছি…কোর্টে যাই বিলাতী পোষাক পরে…গায়ে থাকে ওপ্‌ন্‌-ব্রেষ্ট কালো আলপাকার কোট। কোর্ট থেকে বাড়ী গিয়ে পোষাক বদলে বিচিত্রার আসরে আসা…তাতে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটবে… তাই আমি কোর্টের সেই পোষাকেই আসি বিচিত্রার আসরে, এবং আসরের আর সকলে ধুতি-চাদরে এসে বসেন— তাঁদের মধ্যে ঐ পোষাকে আমি হংস মধ্যে বকো যথা! আমি ঘরে ঢুকে দরজার পাশেই বসে পড়তুম…বেশ কুণ্ঠা-ভরে। চারুচন্দ্র, মণিলাল, সত্যেন…তাঁরা বসতেন রবীন্দ্রনাথের পাশেই। আমাকে ওখানে বসতে দেখে চারুচন্দ্র চোখের নীরব ভাষায় আমায় ইঙ্গিত করতেন—তাঁদের কাছে

এসে বসবার জন্য! আমিও চোখের নীরব ভাষায় জানাতুম—না!

দুদিন তিনদিন এমনি চোখে-চোখে দুজনের ভাষা-বিনিময়ের পর চতুর্থ দিনে আমি এসে বসবামাত্র চারুচন্দ্র কি বললেন রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে। তাঁর সে-কথা শোনবামাত্র রবীন্দ্রনাথ চাইলেন আমার পানে···বললেন—কে? সৌরীন?

আমি বললুম—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—কি অপরাধ করেছো···ওখানে অমন কুণ্ঠিত হয়ে বসেছো? এগিয়ে এসো!

অত্যন্ত সঙ্কোচভরে আমি বললুম—আজ্ঞে···যে-কোর্টে কাজ করি···যাদের জন্য কাজ করে অর্থ রোজগার করি··· তাদের হাওয়া লেগে আছে এ-কোর্টের পোষাকে। নিজেকে কেমন অশুচি মনে হয় যতক্ষণ এ-পোষাক অঙ্গে থাকে—তাই ওখানে বসতে কেমন বাধে!

হেসে রবীন্দ্রনাথ বললেন—সে কি! তুমি রাজদ্বারে আছো···তোমার কাজ হলো, দুষ্কৃত বিনাশ আর সাধুদের পরিত্রাণ করা। হাকিম আর পুলিশ মিলে কত মানুষকে চোর বানিয়ে জেলে পোরবার জন্য সাধনা করছে। তুমি সেই সব মানুষের কতকগুলোকে 'সাধু' প্রমাণ করিয়ে জেল থেকে পরিত্রাণ করছো। কত সাধুকে পরিত্রাণ করছো—এ-তো পুণ্য কাজ! এতে নিজেকে অশুচি মনে করবে কেন?

তাঁর এ-কথার পর ;আমি কোর্ট থেকে এসে সোজা মণিলালের কাছে :যেতুম (মণিলাল থাকেন সামনে ৬ নম্বরে··· অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে)—সেখানে গিয়ে কোর্টের পোষাক ছেড়ে মণিলালের ধুতি এবং মণিলালের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বিচিত্রার আসরে এসে বসতুম বন্ধুদের কাছে।

এবং এর মাসখানেক পরে একটি ঘটনা ঘটলো :—

একদিন বেশ একটু সকাল-সকাল আমরা এসেছি বিচিত্রার আসরে···এসে দেখি, রবীন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে বসে আছেন··· একা···কেমন উন্মনা ভাব! দেখে আমরা বললুম—চুপ করে বসে আছেন! শরীর অসুস্থ?

তিনি বললেন—না···বিপদ হয়েছে।

বিপদ! আমরা চমকে উঠলুম! রবীন্দ্রনাথ বললেন—তোমাদের রবি ঠাকুরের কাছ থেকে আর তেমন ভালো লেখা পাবে না।

—কেন?

তিনি বললেন—আমার সেই ঝর্ণা কলমটি (fountain pen) হারিয়েছে···পাওয়া যাচ্ছে না। তোমরা জানো না, রবি ঠাকুর গোড়ার দিকটা লেখে···তার পর সেই ঝর্ণা কলম সে-লেখা শেষ করে। এখন সে-ঝর্ণা কলম নেই··· কাজেই রবি ঠাকুরের লেখার বাকিটুকু কে শেষ করবে!

কথাটা এমন করে বলেছিলেন যে আমরা না হেসে থাকতে পারি নি!

এর পর কিছুদিন কেটে গেল·· প্রায় দু' মাস···তার পর একদিন···বেলা তখন বারোটা·· আমি কোর্টে কাজ করছি··· তাঁর খাশ কর্ম্মচারী গোপালবাবু কোর্টে এসে উপস্থিত। ইনি রবীন্দ্রনাথের কাজকর্ম্ম করেন—ব্যাঙ্কে যাওয়া···কোনো চিঠিপত্র নিয়ে কারো সঙ্গে দেখা করা···সেক্রেটারির মতো। তাঁকে পুলিশ কোর্টে দেখে আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলুম—আপনি এখানে? তিনি বললেন—এই দেখুন ব্যাপার!

এ-কথা বলে তিনি একখানা কাগজ দিলেন আমার হাতে। দেখি, কোর্টের কাগজ···শীলমোহর-করা সাক্ষীর সাপনা। সপিনা রবীন্দ্রনাথের নামে···মর্ম্ম: ... প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের সহি করা···তাঁর কোর্টের মোহর মারা সপিনা··· তাতে লেখা—Rabindra Nath Tagore-কে অমুক তারিখে তাঁর কোর্টে ৩৭৯ ধারার কেসে এসে সাক্ষ্য দিতে হবে। ৩৭৯-ধারা হলো চুরির চার্জ্জ!

আমি বললুম—কি চুরি হলো?

কর্ম্মচারী ভদ্রলোক বললেন—সেই ফাউণ্টেন পেন চুরি। দিন পনেরো-কুড়ি পূর্ব্বে জোড়াসাঁকো থানার এক ইন্‌স্‌পেক্টর এসেছিলেন···তাঁর সঙ্গে থানার জমাদার আর পাহারাওয়ালা··· তাদের সঙ্গে কোমরে দড়ি বাঁধা এক চোর। রবীন্দ্রনাথের

সঙ্গে হয়েছিল পুলিশ অফিসারের দেখা। সে-অফিসার বলেন—আসামী দাগী চোর···একটা কেসে ধরা পড়েছে··· তার বাড়ী-ঘর তল্লাস করতে বহু চোরাই জিনিষ পাওয়া গিয়েছে···ঘড়ি, পেন, গহনাপত্র এবং সেই সঙ্গে এই ফাউণ্টেন পেন। কোথা থেকে কোন্‌টা চুরি করেছে, তারি তদন্ত করছি। এ বলে, এ-কলমটি সে চুরি করেছে এ-বাড়ী থেকে···তাই এসেছি কলমটি নিয়ে। দেখুন তো, এ-কলম কি আপনার বাড়ীর ?

কলম দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেন—হ্যাঁ···আমার কলম। বহুদিন থেকে পাচ্ছি না···হারিয়েছে।

এ-কথা নোট-বুকে লিখে নিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর তখনকার মতো চলে যান। রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এ-কলম আমি পাবো না ? তাতে অফিসার বলেন—পাবেন। এর মকর্দ্দমা হবে···মকর্দ্দমার পর কলম আপনি পাবেন। তখন এই পর্য্যন্ত। তার পর আজ খানিক আগে···রবীন্দ্রনাথ স্নান করতে যাবেন···থানার জমাদার গিয়ে এই কাগজ দিয়ে এসেছে—সাক্ষীর সপিনা। সপিনা দেখে তিনি অবসন্নের মতো ইজিচেয়ারে বসে পড়েন···আমায় বলেন, শীগগির কোর্টে যাও সৌরীনবাবুর কাছে···গিয়ে তাঁকে বলবে, এ-সপিনা বন্ধ করা চাই। নাহলে আমাকে যদি কোর্টে যেতে হয়···তাহলে আমি বাঁচবো না···হার্টফেল হয়ে মরে যাবো।

আমি তাঁকে বসালুম। তার পর ম্যাজিষ্ট্রেট (থার্ড প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আনিস-উস-জামান) টিফিনের জন্য তাঁর খাশ-কামরায় গেলে আমি সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সপিনা দেখালুম···ব্যাপার বললুম। বললুম—সামান্য কলম-চুরির কেসে রবীন্দ্রনাথ আসবেন কোর্টে সাক্ষ্য দিতে! সপিনা দেখে ম্যাজিষ্ট্রেটের দু চোখ এত বড়! তিনি বললেন—না, না, তা হতে পারে না। আমি কি নাম দেখে সহি করেছি? জানেন তো, একরাশ কাগজ এনে সহি করায় এরা···ফর্ম্মালিটি···আমিও সই করি···এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কোর্টে আসবেন কি! তা হতে পারে না।

তিনি ডাকলেন কোর্ট-ইন্সপেক্টরকে···তাঁকে বললেন—এ কি করেছেন? রবীন্দ্রনাথের নামে সপিনা বার করেছেন? তিনি বললেন—কি করি স্যর···কলম-চুরিতে শুধু তাঁর নাম ডায়েরিতে লেখা। তিনি কলম সনাক্ত করেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন—যে ভদ্রলোক কোর্টে এসেছেন, উনি এ-কলম চেনেন? আমি বললুম—হ্যাঁ। ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন—তাহলে এখনি নতুন সপিনা লিখে দিন কোর্টবাবু। এই ভদ্রলোক এসে সাক্ষ্য দেবেন কোর্টে···কলম সনাক্ত করবেন। রবীন্দ্রনাথের সপিনা ক্যানসেল করে দিচ্ছি।

তাই হলো···নতুন সপিনা লিখে সহি-মোহর করিয়ে গোপাল বাবুকে দেওয়া হলো। তিনি আসবেন মামলার তারিখে কোর্টে

সাক্ষ্য দিতে। তার পর আমার হাত ধরে ম্যাজিষ্ট্রেটের আকুল অনুরোধ—কোর্টের পরে আপনি তাঁর কাছে যাবেন… বলবেন, আমি তাঁর পায়ে সেলাম জানিয়ে ক্ষমা চাইছি—না জেনে এ-অপরাধ করেছি! তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

কোর্টের পর আমি গিয়ে দেখা করলুম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তিনি বললেন—ভাগ্যে তুমি কোর্টে ছিলে…নাহলে রবীন্দ্রনাথকে আর দেখতে পেতে না…হার্টফেল হয়ে তিনি মারা যেতেন! একদিন তুমি বলেছিলে, কোর্টে কাজ করো…অশুচি মনে হয়! জানো, শাস্ত্রে বলেছে—রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ। তুমি রাজদ্বারে থেকে যে বান্ধবতা করেছো… চিরকাল তা আমার মনে থাকবে!

নয়

রবীন্দ্রনাথ ও রাজনীতি : জাতিপ্রেম : আত্মমর্য্যাদাবোধ

১৯১৭ সালের কথা বলছি :—

আনি বেশান্ত এ-সময়ে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করে এ-দেশবাসীর পক্ষ নিয়ে ইংরেজ শাসকদের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠ হলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর বিখ্যাত চিন্তাশীল প্রবন্ধ 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম'—পাঠ করেন অগষ্ট মাসে

রামমোহন লাইব্রেরীতে। প্রবন্ধটি সুরু করেছিলেন—একটু বাদলার হাওয়া দিয়াছে কি, অমনি আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্য্যন্ত বন্যা বহিয়া যায়… পথিকের জুতা জোড়াটা ছাতার মতোই শিরোধার্য্য হইয়া ওঠে এবং অদ্ভুত এই…গলিচর জীবেরা উভচর জীবের চেয়ে জীবনযাত্রায় যোগ্যতর নয়—শিশুকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে এইটে বছর বছর লক্ষ্য করিতে করিতে আমার চুল পাকিয়া গেল। বর্ষা নামিয়াছে, ট্রামের লাইন কাটাও সুরু…জলস্রোতের সঙ্গে জলস্রোতের দ্বন্দ্ব দেখিয়া গভীরভাবে ভাবিতে লাগিলাম, সহ্য করি কেন?

সহ্য না করিলে যে চলে না এবং না করিলেই যে ভালো চলে, চৌরঙ্গী অঞ্চলে একবার পা বাড়াইলেই তা বোঝা যায়। একই সহর, একই মিউনিসিপালিটি…কেবল তফাৎটা এই, আমাদের সয়…ওদের সয় না। যদি চৌরঙ্গী রাস্তার পনেরো আনার হিস্‌সা ট্রামেরই থাকিত এবং রাস্তা উৎখাত করিয়া লাইন মেরামত এমন সুমধুর গজগমনে চলিত, আজ তবে ট্রাম কোম্পানির দিনে আহার রাত্রে নিদ্রা থাকিত না। মানুষকে, পুঁথিকে, ইশারাকে, গণ্ডীকে বিনাবাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে, তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনো

মতেই ঠাহর হয় না…; এমন কি বিলাতী চশমা পরিলেও না! আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন, তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না…অতএব তোমাদের হাতে কর্ত্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না। * * * আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্ব্বনাশ নয়…স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার অধিকার থাকে। নিখুঁত নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয়, তবে তার চেয়ে নাহয় ভুলই করিলাম। রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্বের অধিকার পাইলে তবেই মানুষকে বড় পরিধির মধ্যে দেখিবার তারা সুযোগ পায়। সেই সুবিধার অভাবে প্রত্যেক মানুষ মানুষ-হিসাবে ছোট হইয়া থাকে। অতএব ভুলচুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া আমরা আত্ম-কর্ত্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব—দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া চলার দিকে বাধা দিয়ো না। আমাদের সমাজের, আমাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধারণায় দুর্ব্বলতা যথেষ্ট আছে…তবু আমরা আত্মকর্ত্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এককোণের বাতিটা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর এক-কোণের বাতি জ্বালাইবার দাবী নাই…এ কাজের কথা নয়। আমাদের ঘরের বাতিটা কিছুকাল হইতে নিবিয়া গিয়াছে…

তোমাদের শিখা হইতে যদি ওটাকে জ্বালাইয়া লইতে চাই, তবে তা লইয়া রাগারাগি করা কল্যাণের নহে। কেন না, ইহাতে তোমাদের আলো কমিবে না এবং উৎসবের আলো বাড়িয়া উঠিবে।

তিনি আরো বলেছিলেন—আমি জানি, আমাদের যুবকদের যৌবন-ধর্ম্ম কখনই চিরদিন ধার-করা বার্দ্ধক্যের মুখোস পরিয়া বিজ্ঞ সাজিবে না···আমরাও মানুষের মত মানুষ চাই, যাঁরা বাহির হইতে দুঃখ এবং স্বজনদের নিকট হইতে ধিক্কার সহিতে প্রস্তুত···যাঁরা বিফলতার আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়াও মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র।

এই বছরেই ভারত-রক্ষা-আইনের অজুহাতে বহু নিরীহ নির্দোষ ব্যক্তিকে বিনাবিচারে বন্দী করিয়া রাখার সমারোহ চলে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের এই অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ দীপ্ত ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সে প্রতিবাদের প্রসঙ্গ তুলে তখনকার বাঙলার গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (২০ নভেম্বর, ১৯১৭) বলেছিলেন—কিছুদিন আগে কোনো সভায় একজন বক্তা ভারত-রক্ষা-আইনকে নিরপরাধ তরুণদের লাঞ্ছিত করবার জন্য 'ভারতীয়দিগের উপর অত্যাচার আইন' বলে বর্ণনা করেছেন। এমন কি, স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তিতে

তাঁর নামের সম্ভ্রম এবং গুরুত্ব থাকা অনিবার্য্য…তিনিও বলেছেন, 'জনগণ যদি মনে করেন, যাদের দণ্ড দেওয়া হয়… তাদের মধ্যে অনেকে নিরপরাধ'…দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে কোনো গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উপেক্ষণীয় হতে পারে না। সেই জন্য আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ না করে থাকতে পারি না।

লর্ড রোনাল্ডশের এই সদম্ভ উক্তির প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে করেছিলেন…Modern Review পত্রে ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখে। সে-প্রবন্ধের ফুটনোটে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'আমার প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর লর্ড রোনাল্ডসে ব্যবস্থাপক সভায় আমার কোনো ইংরেজ বন্ধুকে লিখিত আমার পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। আমি সুস্পষ্টভাবে বলিতে চাই, ভারত-রক্ষা-আইনের বলে যাহাদিগকে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহাদিগের সকলের বা কাহারো অপরাধ বা অপরাধের অভাব সম্বন্ধে মত সেই পত্রে বা আমার প্রবন্ধে প্রকাশ করা হয় নাই।

আমি এই কথা বলিতে চাই যে, এ পর্য্যন্ত গোপনে লোককে অপরাধী স্থির করিয়া দণ্ডদানের যে নীতির অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে আমার বহু দেশবাসী মনে করিয়াছেন, দণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই নিরপরাধ। কারাকক্ষে, কখন কখন নির্জ্জন কক্ষে লোকদের আবদ্ধ

করিয়া রাখার প্রথা জনগণের নিকট সতর্কতাবলম্বন না হইয়া প্রতিশোধ-বৃত্তি-চরিতার্থকরণ বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার মুক্তিলাভের পরেও আটক আসামীকে পুলিশের অনুসরণে যেভাবে বিব্রত করা হয়, তাহা…সেই কার্য্যের জন্য যাঁহারা দায়ী তাঁহারা অস্বীকার করিলেও, যাহারা বিব্রত হয়… তাহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর।

সরকারের এই নীতির ফলে সর্ব্বত্র যে আতঙ্ক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে নিরপরাধ ব্যক্তিদিগেরও নিজের নিজের উন্নতিকর বা জনসাধারণের কার্য্যের আগ্রহ পঙ্গু ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। ইহাতে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে…তাহাতে আমাদিগের পক্ষে অপরিচিতের সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বাপর-অনুসৃত সম্বন্ধ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়াছে এবং ইহার আরো শোচনীয় ফল হইয়াছে এই যে, আতিথেয়তা ও দয়া সর্ব্বব্যাপী সংশয় সন্দেহে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে।'

এর কোনো প্রতিবাদ ওঠেনি গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে এবং রবীন্দ্রনাথের এ-প্রবন্ধ প্রকাশের ছ মাস পরে (১৯১৮… ১১ই জানুয়ারি) রবীন্দ্রনাথ তাঁর এ-উক্তির সমর্থনে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেন—

'গত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে শান্তিনিকেতনের ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক ছাত্র অনাথবন্ধু চৌধুরী বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় ক্ষোভে আশ্রম হইতে পলাইয়া যায়।

সে আট বৎসর শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করিতেছে। পরদিন প্রাতেই পুলিশ তাহাকে ভাগলপুরে গ্রেফতার করে এবং ভারত রক্ষা আইনের বিধানে তাহাকে এখনও কারাগারে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। অনাথের পিতার আবেদন এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আমার তারেও তাহার অপরাধ সম্বন্ধে কোনো সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই ব্যাপার সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয়, পুলিশ অনাথের আটক সম্বন্ধে কোন সংবাদ আশ্রমে আমাদিগকে দেয় নাই; অনাথের পিতাকে যে তাহাকে বিশেষ সতর্কভাবে রক্ষা করিতে বলা হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে অপরাধী বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ষোড়শ বর্ষ মাত্র বয়স্ক একটি বালককে দণ্ড দিতে বিলম্ব করা হয় নাই...অথচ দণ্ডদানের কারণ গোপন রাখা হইয়াছে। আমরা উৎকন্ঠিত চিত্তে একটা গল্প প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছি...কিন্তু গল্প রচিত হইতে এবং এই বালকটির মুক্তিলাভ করিতে যে বিলম্ব হয়...তাহা নিষ্ঠুর। যদি আমাদিগের শাসকদিগের তাহাই বিধান হয়...তবে আমরা কাহারও নিকট হইতে কৈফিয়তের বা প্রতিকারের দাবী না করিয়া আমাদিগের অভিযোগ আমরা নিজেরাই সহ্য করিব। কিন্তু আমাদিগের যখন এইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায়-ব্যবস্থায় আস্থা স্থাপন করিতে বলা হয়, তখন অদৃষ্টে নির্ভর করিবার যে ভাব প্রাচীতে আমরা

অনুশীলন করি, তাহাতেও আমরা অবিচলিত থাকিতে পারি না।'

ভারত-রক্ষা-আইনের এমন সুস্পষ্ট প্রতিবাদ ভারতে আর কেউ করতে পারেননি! রবীন্দ্রনাথের এই তেজ এবং নির্ভীকতা কবিজনোচিত নয় নিশ্চয়···এ-মনোভাব আদর্শ দেশ-নেতার পক্ষেই শুধু সম্ভব।

এই বছরেই কলকাতায় হয় কংগ্রেসের অধিবেশন। এক পার্টি চেয়েছিলেন, অ্যানি বেশান্ত হবেন প্রেসিডেণ্ট···কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর দল তাতে আপত্তি তোলেন। তখন মতিলাল ঘোষ এবং তাঁর সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ বসু, চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ফজলুল হক প্রভৃতি এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। রবীন্দ্র-নাথেরও ইচ্ছা, অ্যানি বেশান্ত করবেন অধিনায়কতা। এঁদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হতে সম্মত হলেন···তবে তাঁর সর্ত্ত, কারো সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়···এ-আসন যদি শূন্য থাকে, তবেই তিনি এ-আসন গ্রহণ করবেন। রবীন্দ্রনাথ হলেন চেয়ারম্যান। এই কংগ্রেসের অধিবেশনে সভার উদ্বোধন হয় 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে এবং সে-গান গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ-গান গাইবার পরে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন ইংরেজীতে তাঁর লেখা ভারতের প্রার্থনা—India's Prayer. তার কটি মাত্র

ছত্র উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। সে কটি ছত্র—

Thou hast given us to live
Let us uphold this honour
With all our strength and will.
...In Thy name we oppose the power
That would plant its banes upon our soul.
...Give us power to resist pleasure
Where it enslaves us ;
To lift our sorrow up to Thee
As the summer holds the mid-day sun.
...Make us strong that we may not
Insult the weak and the fallen ;
That we may hold our love high
Where all things around us
Are working the dust.

কংগ্রেসের জন্য কলকাতায় যে-সব নেতা এসেছিলেন... তাঁদের সামনে এবং বিচিত্রার সদস্যদের সামনে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর প্রাঙ্গণে ষ্টেজ বেঁধে ডাকঘর নাটিকার অভিনয় হয়। সে-অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, অসিতকুমার হালদার প্রভৃতি অভিনয় করেছিলেন। তিলক মহারাজ, গান্ধিজী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য,

আনি বেশান্ত—সকলে অভিনয় দেখে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন।

এই সময়ে সেক্রেটারি-অফ-ষ্টেট মণ্টেগু সাহেব ভারতে আসেন তাঁর 'রিফর্ম' নিয়ে। তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপর সেই স্যাডলার কমিশন! এ-কমিশনের ব্যাপারকে ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'তোতা-কাহিনী'—এ গল্পটি সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটি ছাপতে দেবার আগে বিচিত্রার আসরে আমাদের সকলকে সেটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। 'পলাতকা'র কবিতা এই সময়ে লেখা—সেগুলিও বিচিত্রার আসরে পড়া হয়েছিল এবং বিচিত্রার আসরেই তাঁর 'সাতান্ন বছর' বয়সের উৎসব সম্পাদিত হয়েছিল।

কংগ্রেসের ঐ-অধিবেশনের অব্যবহিত পরে আনি বেশান্ত এবং তাঁর কর্ম্মসঙ্গী মিষ্টার আরুণ্ডেল হন ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের আদেশে গ্রেফতার। তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয় একটি সর্ত্তে··· সে সর্ত্ত, মণ্টেগু আসছেন ভারতবর্ষে···সে সময় আনি বেশান্ত বা আরুণ্ডেল কোনো বক্তৃতাদির দ্বারা দেশের জনসাধারণের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করবেন না···তাঁদের শান্তভাবে থাকতে হবে। এ-ব্যাপার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'ছোট বড়' প্রবন্ধ পড়েছিলেন রামমোহন লাইব্রেরীতে। এ-প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—আনি বেশান্তকে বড় ইংরেজ

ক্ষমা করিয়াছেন···ছোট ইংরেজ তাই লইয়া এখনো গর্জ্জাইতেছে। * * * কিছুদিন আগে বিনা-বিচারে শত শত লোককে বন্দী করার বিরুদ্ধে একখানি ছোট চিঠি লিখিয়া-ছিলাম—ইহাতে ভারতজীবী কোনো ইংরেজী কাগজ আমাকে মিথ্যুক ও extremist বলিয়াছিল। ইহারা ভারতসচিবের তকমাহীন সচিব। সুতরাং আমাদিগকে সত্য করিয়া জানা উহাদের পক্ষে অনাবশ্যক···অতএব আমি ইহাদিগকে ক্ষমা করিব। * * * ইংরেজীতে যাকে short cut বলে, আদিমকালের ইতিহাসে তাহা চলিত ছিল। 'লে আও···উস্‌কো শির লে আও'—এই প্রণালীতে গ্রন্থি খুলিবার বিরক্তি বাঁচিয়া যাইত, এককোপে গ্রন্থি কাটা পড়িত। য়ুরোপের অহঙ্কার এই যে, সে আবিষ্কার করিয়াছে···এই সহজ প্রণালীতে গ্রন্থি কাটা পড়ে বটে··· কিন্তু মালের গুরুতর লোকসান ঘটে। সভ্যতার একটি দায়িত্ব আছে—সকল সঙ্কটেই সে-দায়িত্ব তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। স্বীকার করি, কাজ কঠিন হইয়াছে···বাংলা দেশের একদল বালক ও যুবক স্বদেশের সঙ্গে স্বদেশীর যোগ-সাধনের বাধা অতিক্রমের যে-পথ অবলম্বন করিয়াছে ···তাহার জন্য আমরা লজ্জিত আছি! আরো লজ্জিত হই এই জন্য যে, দেশের প্রতি কর্ত্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্ম্মনীতির বিচ্ছেদসাধন করাতে অকর্ত্তব্য নাই—এ-কথা আমরা

বঙ্কিমের কাছ হইতেই শিখিয়াছি। পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা এবং পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি পশ্চিম সোনার সঙ্গে পারদ মিশানোর মত মনে করেন...মনে করেন, ওটুকু না থাকিলে সোনা শক্ত হয় না।

মণ্টেগু-রিফর্মের দান পেয়ে দেশের রাজনীতিক দলের যাঁরা তখন চাঁই...তাঁরা নৃত্য করেছিলেন। তাঁদের সতর্ক করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বাধিকার-প্রমত্ত' প্রবন্ধে বলেছিলেন —এক হাতে দিয়া যত দিবে, আর এক হাত দিয়া তার চেয়ে বেশি হরণ করিবে। স্বার্থের দানকে পরীক্ষা করিয়া লইবার বেলা দেখিব, তাহাতে এত ছিদ্র যে আমাদিগকে ভাসাইয়া দিবে কি, তাহাকে ভাসাইয়া রাখাই শক্ত।

য়িহুদী যখন পরাধীন ছিল, তখন রোমের হাত হইতে দক্ষিণাস্বরূপ তাহারা স্বাধীনতা পায় নাই। পরে এমন ঘটিয়াছে যে, য়িহুদী দেশছাড়া হইয়া বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার রাষ্ট্রও নাই, রাষ্ট্রতন্ত্রও নাই...কিন্তু তাহার ইতিহাসে এইটেই সকলের চেয়ে গুরুতর কথা নয়...তাহার কাছ হইতে প্রাণের বীজ উড়িয়া আসিয়া য়ুরোপকে নূতন মনুষ্যত্ব দান করিয়াছে। সে যাহা দিয়াছে, তাহাতেই তাহার সার্থকতা। যাহা হারাইয়াছে, যাহা পায় নাই... সেটা সত্ত্বেও সে বড়—ইতিহাসে তাহার প্রমাণ হইয়াছে।

এই ভিক্ষার ডাকে আমরা মানুষ হইব না। আমাদের পিতামহরা অমরলোক হইতে আমাদের আহ্বান করিতেছেন... বলিতেছেন—তোমরা যে অমৃতের পুত্র...এই কথা জানো এবং এই কথা জানাও। মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীকে এই সত্য দান কর যে, কোন কর্ম্মপ্রণালীতে নয়...রাষ্ট্রতন্ত্রে নয় ...বাণিজ্য-ব্যবস্থায় নয়...যুদ্ধ-অস্ত্রের নিদারুণতায় নয়—তমেব বিদিত্ব অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!

১৯১৮ সালে এক অপূর্ব্ব পর্ব্ব : বাঙলার গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে...তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি গুর্লে সাহেব। শান্তিনিকেতনে এনড্রুজ সাহেবকে তিনি জানালেন— সানফ্রান্সিসকো থেকে গভর্ণমেণ্ট সংবাদ পেয়েছেন যে, যে-সব সন্ত্রাসবাদী ভারতীয় যুবকের বিরুদ্ধে মকর্দ্দমা চলেছে ...রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাদের যোগ আছে। তার উপর রবীন্দ্রনাথ যে ১৯১৬ সালে আমেরিকা-ভ্রমণে গিয়েছিলেন... সে-ভ্রমণের যাবতীয় ব্যয়ের টাকা তিনি পেয়েছিলেন জার্মাণীর কাছ থেকে—তার জোরেই তিনি ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে অমন জোর গলায় নিন্দাবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ-সংবাদ পেয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে প্রতিবাদ জানিয়ে বেশ কড়া চিঠি লিখেছিলেন। এ-পত্র পাবার পর বহু অনুনয়-বিনয় করে আমেরিকা করেছিল রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ...আমেরিকায় যাবার জন্য—কিন্তু

রবীন্দ্রনাথ সে-নিমন্ত্রণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। এই ব্যাপার চলেছে…তখন রবীন্দ্রনাথ খবর পেলেন, বন্ধু পীয়ার্সন সাহেবকে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট গ্রেফতার করে ইংলণ্ডে পাঠিয়েছেন…দ্বীপান্তরী কয়েদীর মতো। তাঁর অপরাধ—জাপানে এবং আমেরিকায় তিনি ব্রিটিশ-বিদ্বেষ প্রচার করেছেন। এ-সংবাদে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কাতর হলেন। সেই সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার (বেলা দেবী) হলো অকালমৃত্যু (১৯১৮ · ১৬ই মে)। রবীন্দ্রনাথ দার্জ্জিলিং যাবেন স্থির করেছিলেন…শোকাহত হয়ে দার্জ্জিলিং গেলেন না…শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। তারপর পূজার সময় তিনি গেলেন মাদ্রাজে—মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরলেন ডিসেম্বর মাসে। রবীন্দ্রনাথ তখন আর-সব ত্যাগ করে বিদ্যালয়টিকে নানাদিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বভারতী রূপে গড়ে তুলবেন…সঙ্কল্প করলেন—a true centre for the different cultures of the East.

বাঙলা ১৩২৪ সালের শেষাশেষি গভর্ণমেণ্ট এক কমিশনের ব্যবস্থা করেন—রাউলাট কমিটি। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবার জন্য চক্রান্তকারীর দল আছে কিনা…যদি থাকে, তাহলে সে-দলকে বিনষ্ট করবার পক্ষে গভর্ণমেণ্টের যে-সব বাধা বা অসুবিধা আছে…কি উপায়ে তা দূর করা যায়… সে-সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার জন্য এ-কমিটি-নিয়োগ। বিলাতের

হাইকোর্টের জজ রাউলাট এ-কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হয়ে ভারতে আসেন। এ-কমিটির পরামর্শে ১৯২৯ সালে মিশরে যে Egyptian Law of Suspect পাশ হয়েছিল…সেই আইন চালু হবে। কজন সরকারী এবং কজন বে-সরকারী লোক (বে-সরকারী থেকে লটারি করে চারজনকে নেওয়া হবে)…এঁরা যাকে সন্দেহযোগ্য মনে করবেন…পুলিশের কাগজপত্রে যদি তা সাব্যস্ত হয়, তাহলে সে-লোককে বিনাবিচারে অন্তরীণ করা হবে।

ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তখন নানাভাবে ভারতবাসীর উপর অকথ্য নির্য্যাতন নিপীড়ন সুরু করলো। বিনা-বিচারে যাকে-তাকে আটক করে রাখা…খয়ের-খাঁ পুলিশের যা-তা মিথ্যা রিপোর্টের ছুতা ধরে! তার চেয়েও নৃশংস অত্যাচার ঘটলো পাঞ্জাবের অমৃতসরে—জালিয়ানওয়ালাবাগে! সেখানে দড়ি খাটিয়ে তার তলা দিয়ে লোকজন চলবে—পাঞ্জাবের ছোটলাট ও-ডায়ারের হলো নির্দ্দেশ এবং তা নিয়ে জনগণ যখন জালিয়ান-ওয়ালাবাগে প্রতিবাদ জানাতে সমবেত হলেন, তখন ছোটলাট ও-ডায়ারের নৃশংস আদেশে অসংখ্য জনগণকে… স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-যুবা নির্ব্বিশেষে শেয়াল-কুকুরের মতো গুলি করে মারা হলো…১৩ই এপ্রিল তারিখে, ১৯১৯ সালে। তার পূর্ব্বে রাউলাট কমিটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গান্ধিজী সত্যাগ্রহ পালন করছেন এবং রবীন্দ্রনাথ

তাঁকে পত্র লিখে সমর্থন জানিয়ে এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন যে গভর্ণমেণ্ট মরিয়া হয়ে উঠেছে…তার অত্যাচার এবার সীমাহীন হয়ে উঠবে! এবং অবশেষে তাই হলো। জালিয়ানওয়ালাবাগের এ-হত্যাকাণ্ডের সংবাদ গভর্ণমেণ্ট বেশ হুঁশিয়ার হয়ে চাপা দিয়েছিল—ভারতের অন্য প্রদেশে এ-খবরের বাষ্প না প্রবেশ করে! এত চাপাচাপি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এ-সংবাদ পেলেন মে মাসের শেষাশেষি। এ-খবর পাবামাত্র তিনি কলকাতায় এলেন ২৭শে মে তারিখে…এসে দেশের নেতাদের ধরলেন—এর প্রতিবাদ করা চাই…চলুন সকলে অমৃতসরে। তাঁরা রাজী হলেন না! শুধু অমৃতসরে না-যাওয়া নয়…এ-সম্বন্ধে একটি কথাও কেউ কণ্ঠ থেকে নিঃসারিত করলেন ''। রবীন্দ্রনাথ তখন গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করে ভারতের বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে দীর্ঘ পত্র লিখলেন। সে-পত্র পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনাহীন! চিঠি তিনি ইংরেজীতেই লিখেছিলেন এবং সে-চিঠির বাঙলা অনুবাদ তাঁরই করা। তিনি লিখেছিলেন—

Your Excellency,

The enormity of the measures taken by the Government of the Punjab for quelling some

local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The accounts of the insult and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers···The very least I can do to my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glazing in the incongruous counter of humiliation and I for my part wish to stand shorn of all special distinctions by the side of my countrymen who for their so-called insignificance are liable to suffer degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have compelled me to ask your

Excellency to relieve me of my title of Knighthood ties.

Yours faithfully,

Calcutta, Rabindranath Tagore

6, Dwarkanath Tagore Ln.

May 30, 1919

এ-পত্রের বাঙলা অনুবাদ :—কয়েকটি স্থানীয় হাঙ্গামা শান্ত করিবার উপলক্ষে পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন…তাহার প্রচণ্ডতায় আজ আমাদের মন কঠিন আঘাত পাইয়া ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছে। হতভাগা পাঞ্জাবীদিগকে যে-রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহার অপরিমিত কঠোরতা ও সেই দণ্ডপ্রয়োগবিধির বিশেষত্ব আমাদের মতে কয়েকটি আধুনিক ও পূর্ব্বতন দৃষ্টান্ত বাদে সকল সভ্য শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তুলনাহীন। যে-প্রজাদের প্রতি এইরূপ বিধান করা হইয়াছে, যখন চিন্তা করিয়া দেখা যায় তাহারা কিরূপ নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল এবং যাঁহারা এইরূপ বিধান করিয়াছেন… তাঁহাদের লোকহনন-ব্যবস্থা কিরূপ নিদারুণ নৈপুণ্যশালী, তখন একথা আমাদিগকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে যে, এরূপ বিধান পোলিটিক্যাল বা ধর্ম্মবিচারের দোহাই দিয়া নিজের সাফাই করিতে পারে না। পাঞ্জাবী নেতারা যে

অপমান ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, নিষেধরুদ্ধ কঠোর বাধা ভেদ করিয়াও তাহার বিষয় ভারতবর্ষের দূরদূরান্তে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তদুপলক্ষে সর্ব্বত্র জনসাধারণের মনে যে বেদনাপূর্ণ ধিক্কার জাগ্রত হইল, আমাদের কর্তৃপক্ষ তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ এই কল্পনা করিয়া তাঁহারা আত্মশ্লাঘা বোধ করিয়াছেন যে, ইহাতে আমাদিগের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইল। এখানকার ইংরাজচালিত অধিকাংশ সংবাদপত্র এই নির্ম্মমতার প্রশংসা করিয়াছে এবং কোনও কোনও কাগজে পাশব নৈষ্ঠুর্য্যের সহিত আমাদের দুঃখভোগ লইয়া পরিহাস করা হইয়াছে। অথচ আমাদের যে-সকল শাসনকর্ত্তা পীড়িত পক্ষের সংবাদপত্রে ব্যথিতের আর্ত্তধ্বনি বা শাসননীতির ঔচিত্য আলোচনা বলপূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিবার জন্য নিদারুণ তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছেন··· তাঁহারাই উক্ত ইংরাজচালিত সংবাদপত্রের কোন চাঞ্চল্যকে কিছুমাত্র নিবারণ করেন নাই। যখন জানিলাম যে, আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হইল, যখন দেখা গেল, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিতে আমাদের গভর্ণমেণ্টের মতের রাষ্ট্রধর্ম্ম অন্ধ করিয়াছে, অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্ম্মনিয়মের অনুযায়িক মহদাশয়তা অবলম্বন করা এই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কত সহজ কার্য্য ছিল···তখন স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় আমি এইটুকুমাত্র

করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি যে, আমাদের বহু কোটি যে ভারতীয় প্রজা অদ্য আকাস্মিক আতঙ্কে নির্বাক হইয়াছে, তাহাদের আবৃত্তিকে বাণীদান করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে আমি নিজে প্রেরণ করিব। অদ্যকার দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলি চতুর্দ্দিকবর্ত্তী জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে। অন্তত: আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, আমার যে-সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মানচিহ্ন বর্জ্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি। রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে নাইট উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। সে-মান পূর্ব্বতন যে-রাজপ্রতিনিধির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহার উদারচিত্ততার প্রতি চিরদিন আমার পরম শ্রদ্ধা আছে। উপরে বিবৃত কারণবশতঃ বড় দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অদ্য এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে এই নাইট পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতিদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

আপনার অনুগত

(স্বাক্ষর) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐ পত্রের কথা যেদিন দেশে প্রচার হলো সেদিন দেশের জনসাধারণ রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রীতি, দেশবাসীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা, সম্মান-মর্য্যাদাবোধ এবং সাহস আর তেজের পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধায় তাঁর চরণে মাথা নত করেছিল !

এ-ব্যাপারে ইংরেজরা রাগে জলে উঠেছিল এবং তখনকার ইংরেজ সমাজের মুখপাত্র 'ইংলিশম্যান' পত্রে যে-মন্তব্য ছাপা হয়েছিল, এখনকার পাঠকের সামনে তার মর্ম্মার্থ তুলে ধরছি—

তাঁর এ-কাজের জন্য তাঁর চেয়ে আর কেউ দুঃখিত হবে না। কারণ এতে কারো কিছু এসে যাবে না। স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—যাঁর নামও পাঞ্জাবের জঙ্গলে কেউ কখনো শোনেনি…তিনি গভর্ণমেণ্টের পলিশির সমর্থন করলেন, কি না করলেন…তার জন্য কারো মাথাব্যথা নেই ! বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' রইলেন, কি, সাদাসিধে বাঙালীবাবু রইলেন, তাতে ব্রিটিশ-শাসনের মানের হানি বা ব্রিটিশ-শাসনের নিরাপত্তা এতটুকু টসকাবে না !

এর পরে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী-স্থাপনার কাজে নিজেকে সমর্পণ করলেন। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য অনুশীলনের জন্য বিদ্যাভবন খোলা হলো জুলাই মাসে (১৯১৯)। তারপর পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর অধ্যক্ষতায় হলো তিব্বতী এবং চীনাভাষার শিক্ষা এবং অনুশীলনের ব্যবস্থা, এবং

রবীন্দ্রনাথ নিজে সঙ্গীত এবং সাহিত্য অধ্যাপনা করতে লাগলেন। 'শারদোৎসব' নাটিকাখানিকে নূতন করে লিখলেন···এ-নাটকের নাম দিলেন 'ঋণশোধ। তারপর অক্টোবর-নভেম্বর দু মাস তিনি ছিলেন শিলঙে। ফিরে এসে শান্তিনিকেতনে নৃত্য-শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন; নৃত্য-শিক্ষার ভার দিলেন দুজন সুযোগ্য মণিপুরী শিক্ষকের উপর। ১৯২০ সালে লর্ড রোনাল্ডস্‌ এলেন শান্তিনিকেতনে। তারপর রবীন্দ্রনাথ গুজরাটে গেলেন গুজরাটী সাহিত্য-সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হয়ে···ফেরবার পথে শবরমতী আশ্রমে মহাত্মা গান্ধির সাহচর্য্যে কাথিক ভাটনগর এবং লিম্বডিতে আসেন। লিম্বডির রাজা তাঁকে দেন দশ হাজার টাকা শান্তিনিকেতনের জন্য। সেখান থেকে আমেদাবাদ, বোম্বাই এবং সুরাট হয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন ১৯২০ সালের ৩রা মে—তারপর ১১ই মে কলকাতা থেকে য়ুরোপ-যাত্রা।

বিলাতের ইণ্ডিয়া-অফিসে তিনি সাক্ষাৎ করলেন সেক্রেটারি অফ ষ্টেট মণ্টেগু এবং লর্ড সিংহের সঙ্গে। লর্ড সিংহ তখন আণ্ডার সেক্রেটারি। তাঁদের সঙ্গে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মণ্টেগুকে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বললেন —জেনারেল ডায়ারের শাস্তির জন্য ভারতবাসী তত আকুল নয়···ভারতবাসী চায়, এ-নৃশংস ব্যাপারের ইংরেজ-জাতি

নিন্দা করুক—moral condemnation of the crime by the British nation. ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জকে এবং আরো কয়েকজনকে রবীন্দ্রনাথ পত্র লিখে অনুরোধ জানান. লর্ড চেমসফোর্ডের পর লর্ড মণ্টেগুকে যেন ভারতের বড়লাট করে পাঠানো হয়!

ইংলণ্ড থেকে তিনি আসেন ফ্রান্সে। সেখানে ফ্রান্সের সব চেয়ে বড় ধনী কাথের অতিথি হয়ে বাস করেছিলেন। এখানে প্রোফেশর সিলভিয়ান লেভি এবং দে ফ্রাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়। পারি শহরে কবি কাউণ্টেস নোয়ালির সঙ্গে হলো ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এখানে তাঁর থাকবার সময় গীতাঞ্জলির ফরাসী ভাষার অনুবাদ সুসম্পন্ন হয়। ফ্রান্স থেকে তিনি হলাণ্ড যাত্রা করেন…হলাণ্ডের সাগ্রহ নিমন্ত্রণে। হলাণ্ড থেকে বেলজিয়াম-রাজের নিমন্ত্রণে বেলজিয়াম-যাত্রা। এইরূপে য়ুরোপের নানা দেশ ঘুরে তিনি আসেন নিউ-ইয়র্কে ১৯২০ সালের ২৮শে অক্টোবর। নিউইয়র্ক-যাত্রায় পীয়ার্শন সাহেব ছিলেন তাঁর সহযাত্রী।

দশ

য়ুরোপ থেকে প্রত্যাবর্ত্তন—বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা

রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন, তখন দেশে মহাত্মাজীর অসহযোগ-আন্দোলন সূচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আসবামাত্র মৌলভী শওকত আলির সঙ্গে মহাত্মাজী এলেন শান্তিনিকেতনে। আলাপ-আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত জানালেন- শান্তিনিকেতন থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্য কোনো ছাত্রছাত্রী তিনি পাঠাবেন না; কলকাতার কলেজের অনেক ছাত্রছাত্রী অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ত্যাগ করে সুরুলে এলেন পল্লী-সংস্কারের কাজ করতে।

সাংবাদিকের দলও শান্তিনিকেতনে এসে উপস্থিত—গান্ধিজীর অসহযোগ-আন্দোলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি মত, জানবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিলেন—মনোবলের উপর রবীন্দ্রনাথের অসীম শ্রদ্ধা···মনের বলকে তিনি চিরদিন শিরোধার্য্য করেন···অহিংসা বিজয়লাভের প্রধান অস্ত্র; পশুবলকে তিনি চিরদিন ঘৃণা করেন। যে-গভর্ণমেণ্ট অন্যায় করে·· ···সে-গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কাকেও আমি সংস্রব রাখতে বলি না···তবে এই সংস্রব-বর্জ্জন যাতে সহজভাবে, স্বাভাবিকভাবে হয়, এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে' এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা লজ্জাজনক এবং তা অসঙ্গত। তাতে বিদ্বেষ আসবেই; বিদ্বেষ আর non-violence পরস্পরবিরোধী। কাজেই এক্ষেত্রে মহাত্মার সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ নেই। তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার। মহাত্মার সহযোগিতা-বর্জ্জন চিরন্তন 'না' নয়।

সে একটি প্রকৃত 'হাঁ' এবং প্রকৃত সহযোগিতা-লাভের সোপান মাত্র—এ-কথা মহাত্মা বারবার বলেছেন। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনের সদুপায় করা উচিত। ভদ্র সম্বন্ধের মাঝখানে স্বাধীনতা আছে।

শান্তিনিকেতনকে গড়ে তোলবার জন্য তাঁর চিন্তা, তাঁর অধ্যবসায় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এ-দেশে শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য :

তিনি বলেন—এ-কথা প্রমাণ হইয়া গেছে যে, ভারতবর্ষ নিজেরই মানসশক্তি দিয়া শিক্ষাসমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা…যাহার কল্যাণে আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা-মনের শিক্ষা নহে—তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে। ভিক্ষাজীবিতায় কখনো কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।

তিনি বলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন …গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে, যাঁহারা নিজেদের শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও

সৃষ্টির কার্য্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন, সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে। সেই উৎসধারার নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিতে হইবে না।

এ সম্বন্ধে তাঁর তৃতীয় কথা—সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবল কেরাণীগিরি, ওকালতি, ডাক্তারী, ডেপুটিগিরি, মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কামারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে ও-শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো সভ্য দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মত পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষের যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তবে গোড়া হইতেই সে-বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা স্থানের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে,

গোপালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র, শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে। এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি বিশ্বভারতী নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।

দেশের জন্য, জাতির জন্য তাঁর প্রার্থনা ছিল :—

এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয় রাজভয় মৃত্যুভয় আর !
দীনপ্রাণ দুর্ব্বলের এ পাষাণভার
এই চির-পেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অপমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্য-মর্য্যাদা-গর্ব্ব চির-পরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর কর।......

এবং বিশ্বভারতীতে এই আদর্শে মনের শিক্ষার ব্যবস্থাই তিনি করতে চেয়েছিলেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ—কবি-প্রতিভায় তিনি বিশ্ববরেণ্য… তিনি বাঁশী বাজান…তাঁর সে-বাঁশীতে কি উদ্দীপনা জাগে—দেশের অধিনায়কতা করার কতখানি যোগ্যতা…এমন তেজস্বী, এমন নির্ভীক, এমন মর্য্যাদাবোধসম্পন্ন…অথচ কতখানি তাঁর প্রাকটিকাল সেন্স! দেশকে স্বাধীন করবার আগে পরাধীন দুর্ব্বল দেশবাসীকে মানুষ করে গড়ে তোলবার দিকে তাঁর দৃষ্টি…এবং শুধু দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রবন্ধ লেখা নয়, বক্তৃতা দেওয়া নয়…হাতে-কলমে অগাধ পরিশ্রমে সহস্র বাহু হয়ে কাজ করা—এমন কবি, এমন দেশনায়ক, এমন মানুষের তুলনা মিলবে না পৃথিবীতে!

ইংরেজের আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি নির্ভীক ভাবে চিরদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি একবার লিখেছিলেন—"আজকাল সাহেব তিনটি মাসের ছুটি পাইলেই তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডে পলাইয়া গিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত ধূলা ধৌত করিয়া আসেন; এবং ভারতবর্ষেও তাঁহাদের আত্মীয়সমাজ ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে। এইজন্য যেদেশ তাঁহারা জয় করিয়াছেন, সে জাতিকে ভালো না বাসিয়াও সেখানে কাজ করা সুসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সহস্র ক্রোশ দূর হইতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া একটি সম্পূর্ণ বিদেশী রাজ্য নিতান্ত আপিসের কাজের ন্যায় দিনের বেলায় শাসন করিয়া সন্ধ্যাবেলায় পুনশ্চ সমুদ্রে

খেয়া দিয়া বাড়ী গিয়া তপ্ত ভাত খাওয়া—ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে ?”

অত্যাচারী মোগল সম্রাটের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধবিহীন ইংরেজ শাসকদের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ দুটি কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—সেদিনের অত্যাচার ছিল একটি রাজার…আজ দেশশুদ্ধ ইংরেজ আমাদেব রাজা হইয়া বসিয়াছেন—বহুবাজকতা। এতগুলি রাজাকে তুষ্ট করা দুর্ব্বল ভারতের সাধ্যাতীত।

হোম চার্জের নামে শীর্ণ ভারতের যে-অর্থ সাগরপারে যেতো…তার বিরুদ্ধে তাঁব আপত্তির সীমা ছিল না। আর একটি কথা তিনি বলেছিলেন—সেকালে রাজার সহিত প্রজার সুখদুঃখের যে হৃদয়ের যোগ ছিল, আজ তাহার অভাব অত্যন্ত প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। তাই তিনি বলতেন—ভগবানের কাছে আমার প্রার্থনা…এমন রাজা দাও, যিনি বলতে পারবেন, ভারতবর্ষ আমারই রাজ্য—বণিকের নয়, ধনিকের নয়, চা-করের নয়, ল্যাঙ্কাশায়াবের নয়। ভারতবর্ষ অন্তরেব সহিত বলিতে পারিবে, আমারই রাজা !

সন্ত্রাসবাদীর হাতে ইংরেজ-হত্যায় রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়েছিলেন। ক্ষোভভরে তিনি বলেছিলেন—প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়। তাঁর বাণী—নিজে সবল হও…স্বাবলম্বী হও। সমাজ-সংস্কার

এবং রাজনীতি···তিনি বলেন—অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। জীবনের পথে যারা পিছিয়ে আছে, রাজনীতির পথে তারা কি করে অগ্রসর হবে?

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হলো ২২শে ডিসেম্বর ১৯২১। রবীন্দ্রনাথ ট্রাষ্ট দলিল লিখে নোবেল-পুরস্কারে-পাওয়া বিপুল অর্থ এবং শান্তিনিকেতনের বাড়ী-ঘর, জমি, লাইব্রেরী এবং তাঁর যাবতীয় বাঙলা গ্রন্থের স্বত্ব বিশ্বভারতীর আনুকূল্যে দান করেন।

১৯২২ সালে তিনি 'মুক্তধারা' নাটক রচনা করেন এবং ১৬ই জানুয়ারি তারিখে কলকাতায় 'বিচিত্রা'র আসরে আমাদের সকলকে আহ্বান করে নাটকখানি পড়ে শোনান। সুরুলে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠাও এই সময়ে হয়। 'মুক্তধারা' নাটক পড়বার পর অভিনয়ের উদ্যোগ করলেন···কিন্তু ১০ মার্চ তারিখে মহাত্মা গান্ধির কারাদণ্ড হবার জন্য অভিনয়ের উদ্যোগ হলো বন্ধ।

১৯২২ সালে···বাঙলা ১৩২৯ সালে কবি সত্যেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন। সত্যেন্দ্রনাথের অকালবিয়োগে রামমোহন লাইব্রেরীতে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ-সভায় রবীন্দ্রনাথ এসে 'সত্যেন্দ্র-স্মরণে' কবিতা পাঠ করেন, এবং এ-সভায় আমি

সত্যেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলুম। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং আমার সে প্রবন্ধ 'ভারতী' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

এর আগে আর একটি ঘটনার কথা বলতে ভুলেছি। বলি—১৯১৯ সালে আমরা…রবীন্দ্র-ভক্তের দল…একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করি। সমিতির নামকরণ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—রবি-মণ্ডলী। মণ্ডলীর সভ্য চারুচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, মণিলাল, আমি, অসিতকুমার হালদার, হেমেন্দ্র-কুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, সুধীর রায়চৌধুরী প্রভৃতি। সমিতির নিয়ম হলো, প্রতি পক্ষান্তর-রবিবারে এক-একজন সদস্যের গৃহে বেলা তিনটার সময় সকলে সমবেত হবেন; যাঁর গৃহে সমাবেশ, তাঁকে স্বরচিত একটি নূতন লেখা পড়ে শোনাতে হবে—তা সে-লেখা কবিতা হোক, গল্প হোক, প্রবন্ধ হোক বা নাটিকা হোক। পড়ার পর সমবেত সভ্যদের সান্ধ্য জলযোগে আপ্যায়িত করা। এ-মণ্ডলীতে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথও যোগ দিয়েছিলেন। রবি-মণ্ডলীর প্রথম আসর বসে সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে…সে আসরে তিনি পড়ে শোনান তাঁর লেখা অপরূপ নাটিকা 'ধূপের ধোঁয়ায়'; তারপর অবনীন্দ্রনাথ রবি-মণ্ডলীর আসরে শোনান তাঁর লেখা একটি নাটিকা; চারুচন্দ্র শুনিয়েছিলেন একটি নাটক…মণিলাল তাঁর 'মুক্তার মুক্তি' নাটিকা…আমি

পড়েছিলুম নাটিকা শাহজাদা…নরেন্দ্র দেব শুনিয়েছিলেন কবিতা…সুধীর রায়চৌধুরী শুনিয়েছিলেন কবিতা…রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছিলেন তাঁর কটি নূতন গান।

আমাদের আর একটি উৎসব চলতো। মাঝে মাঝে দিনেন্দ্রনাথ কলকাতায় আসতেন রবীন্দ্রনাথের লেখা একরাশ নূতন গানের পশরা নিয়ে এবং সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আমাদের আসর বসতো। সে-আসরে নৈশ ভোজ এবং দিনেন্দ্রনাথের গান চলতো…রাত প্রায় একটা-দেড়টা পর্য্যন্ত। রবীন্দ্রনাথই পাঠাতেন দিনেন্দ্রনাথকে—যাও, অনেক গান জমেছে…আমি যেতে পারছি না…তুমি গিয়ে ওদের শুনিয়ে এসো।

১৯১৪ সালে আমার লেখা নাটক রুমেলা মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। এ-নাটকখানি লিখেছিলুম অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশে। তাঁরা মিনার্ভায় গিয়ে অভিনয় দেখেননি; গগনেন্দ্রনাথের গৃহে কি একটা উৎসব-উপলক্ষে মিনার্ভা থিয়েটারকে বায়না করে আনা হয় এবং মিনার্ভাকে তাঁরা বলেন—'রুমেলা' অভিনয় করতে হবে। সে-অভিনয় দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এবং অভিনয় দেখে একটি দৃশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—ভালোবাসা দেখাতে নায়ক গলা ফুলিয়ে যেভাবে কথা বললে…কণ্ঠ গদগদ করে…

অত্যন্ত অস্বাভাবিক। তিনি বললেন—থিয়েটারের জন্য নাটক লেখো···কিন্তু রিহার্শালটা ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ো না···নিজেরা শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। তাঁর এ-কথা আমার পরবর্ত্তী কখানি নাটিকার অভিনয়ে আমি সযত্নে রক্ষা করেছিলুম।

এ-কথা বলার তাৎপর্য্য, তিনি অত বড়···তবু আমাদের মতো ছোটদের উপর ছিল তাঁর কত স্নেহ, কত দরদ, কত ভালোবাসা। এ-বৈশিষ্ট্য কজন মহাপুরুষের আছে···জানি না!

যে-কথা বলছিলুম···দেশের মানুষকে সচেতন করে তোলা···যারা পিছিয়ে আছে, তাদের ডেকে পথের সাথী করা ···নিজেদের মনকে শক্তিমান করে তোলার দিকে ছিল তাঁর লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন—

···এত যে হীনতা, এত লাজ,
তবু ছাড়ি নাই আশা। তোমার বিধান
সঙ্গোপনে সবার নয়ন-অন্তরালে
কেহ নাহি জানে। তোমার ইঙ্গিতে
মুহূর্ত্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে
আপনারে ব্যক্ত করি আপন আলোতে
চির-প্রতীক্ষিত চির-সম্ভবের বেশে।

এই যে আশা···স্বদেশপ্রেমিক কবির প্রবল দেশানুরাগের

এ কি মিথ্যা আশ্বাস? ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই আশারই সার্থকতা দেখা গিয়েছে বারবার।

কিন্তু বুকে আশা নিয়ে থাকলেই চলবে না···সে-আশা পূরণ করবার উপায় নির্ণয় করা চাই··উদ্যোগ করা চাই—নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।

এই উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেসব কথা বলেছেন, তার উল্লেখ প্রয়োজন। তাহলে বুঝবো, কি ধারায় তিনি দেশকে অগ্রসর হতে বলেছেন! কংগ্রেসের কার্য্যধারার পরিচয়ও পাবো তা থেকে।

তিনি বলেছিলেন—কেহ যদি দরখাস্ত-কাগজে নৌকা বানাইয়া সাত সমুদ্র পারে সাত রাজার ধন-মাণিক্যের ব্যবসা চালাইবার প্রস্তাব করে···তবে কারো কারো কাছে লোভনীয় হয়···কিন্তু সেই কাগজের নৌকায় বাণিজ্যে কাহাকেও মূলধন খরচ করিতে পরামর্শ দিই না।

তিনি বলেছিলেন—বাঁধ বাঁধা কঠিন বলিয়া সে স্থলে দল বাঁধিয়া নদীকে সরিয়া বসিতে অনুরোধ করা···কনষ্টিটিউশন্যাল এজিটেশন নামে গণ্য হইতে পারে—তাহা সহজ বটে···কিন্তু সহজ উপায় নহে।

তিনি আরো বলেন—অন্যায়কে অত্যাচারকে একবার যদি কর্ম্মসাধনের সহায় বলিয়া গণ্য করি···তবে অন্তঃকরণকে বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি চলিয়া

যাইবে। ন্যায়ধর্ম্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে—কর্ম্মের স্থিরতা থাকে না; তখন বিশ্বব্যাপী ধর্ম্ম ব্যবস্থার সঙ্গে আবার আমাদের ভ্রষ্ট জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য্য হইয়া ওঠে। প্রশস্ত ধর্ম্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎখাতের সঙ্কীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা...তাহাই মানুষের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা...মানুষের মনুষ্য ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস।

তখন স্বরাজ লাভের সাধনা চলেছে.. স্বরাজ লাভের অপথ বিচার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বারবার সকলকে যেমন সতর্ক করেছিলেন...তেমনি সুপথ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন... তা শুধু প্রণিধানযোগ্য নয়, আমাদের স্বাধীনতা-লাভের ইতিহাসে তা অমর অক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি ব্রাহ্মণ... ব্রাহ্মণের তপস্যার কথা তিনি ভুলতে পারেননি...পৃথিবীর অতি নবীনের চেয়ে নবীনতম হয়েও! তাঁর মনে নিত্য নবীনতা বিরাজ করতো...বাক্যে আচারে ব্যবহারে আমরা তার বহু পরিচয় পেয়েছি চিরকাল। তিনি বলেছেন—মানুষ বিস্তীর্ণ মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যা দ্বারা—ক্রোধে বা কামে সেই তপস্যা ভঙ্গ করে এবং তপস্যার ফলকে এক মুহূর্ত্তে নষ্ট করে দেয়। ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না—তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহাকে নিজের আশু উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে।

উৎপাতের দ্বারা সেই তপঃসাধনা চঞ্চল…সুতরাং নিষ্ফল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন তপস্যা…বহু বৎসর পরে গান্ধিজী ঠিক সেই পদ্ধতিকেই soul-purification বলে বর্ণনা করেছেন। শান্তি এবং সংযম—non-violence-এর তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ যেমন পরিষ্কার করে বুঝিয়েছিলেন…এমন আর কেউ পারেননি। তাঁর এই শান্তি এবং সংযমের কথায় দেশের অনেক লোক বিরক্ত হয়েছিল…কিন্তু পরে মহাত্মাজী তাঁর এসব বাণীকে শিরোধার্য্য করেই ভারতের মুক্তি-সাধনাকে সার্থক করে তুলতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই তপস্যার পদ্ধতি কি…তিনি তা স্পষ্ট করেই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—[illegible]-বুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলি বাহিরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া…ঐ পরের দিক হইতে ভ্রূকুটি-কুটিল মুখটিকে ফিরাও। আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন করিয়া প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপশুষ্ক তৃষ্ণাতুর মাটির উপর নামিয়া আসে, তেমনি করিয়া দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এসো—নানা দিগভিমুখী মঙ্গল-চেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্ব্বপ্রকারে বাঁধিয়া ফেল…কর্ম্মক্ষেত্রকে সর্ব্বত্র বিস্তৃত করো…এমন উদার করিয়া এতদূর বিস্তৃত করো যে

দেশের উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই সেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারি। আমাদিগের প্রতি রাজার সন্দেহ ও প্রতিকূলতা আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতেছে··· কিন্তু কখনই আমাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিবে না—আমরা জয়ী হইবই—বাধার উপর উন্মাদের মত নিজের মাথা ঠুকিয়া নহে···অটল অধ্যবসায়ে তাহাকে শনৈঃশনৈঃ অতিক্রম করিয়া যে জয়ী হইব, তাহা নহে—কার্য্যসিদ্ধির সত্য সাধনাকে দেশের মধ্যে চিরদিনের মত সঞ্চিত করিয়া তুলিব···আমাদের উত্তরপুরুষদের শক্তি-চালনার সমস্ত পথ একটি একটি করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দিব।

আজ ঐ যে বন্দীশালার লৌহশৃঙ্খলে কঠোর ঝঙ্কার শুনা যাইতেছে···দণ্ডধারী পুরুষদের পদশব্দে কম্পমান রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে—উহাকেই বড় করিয়া জানিয়ো না। যদি কান পাতিয়া শোনো···তবে কালের মহাসঙ্গীতের মধ্যে ইহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যায়!

এই সব আঘাত আমাদের ঐক্যের আশ্রয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে—আমাদের শক্তির কেন্দ্র এই আশ্রয়!

এই শক্তিকে দেশের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করা চাই। আমরা যদি দেশের বিদ্যাশিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টা করি, তবে আজ একটা কিছু···কাল একটা কাপড়ের

জন্য যখন তখন তাড়াতাড়ি দুই-চারিজন বক্তা সংগ্রহ করিয়া টাউন হল মিটিংয়ে দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হয় না।

তখন যে স্বদেশী প্রচারের সমারোহ বাধে···সাধ্যমত বিলাতী পণ্যদ্রব্য ব্যবহার না করে দেশীয় শিল্পের রক্ষা এবং উন্নতি সাধনের চেষ্টা···এ স্বদেশী-প্রচারের বহু বৎসর পূর্ব্বে···১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

নিজ হস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও হাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।

সরকারী খেতাবের সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহাশয় ব্যক্তি···ইংরা সরকারের দত্ত রাজামহারাজা উপাধির চেয়ে বড় ছিল আমাদের দেশে।

মহাত্মা গান্ধিকে যে সারা ভারত দেশনায়ক বলে পরে মেনেছিলেন···এই দেশনায়ক বা সমাজপতির আদর্শ সম্বন্ধে বহু বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—আমাদের সমাজ এখন আর এরূপভাবে চলিবে না। কারণ, বাহির হইতে যে উদ্ধত শক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ—তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকান-বাজার পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া সর্ব্বত্রই নিজের একাধিপত্য স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব আকারেই প্রত্যক্ষগণ্য

করিতেছে। এখন সমাজকে উহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে; তাহা করাইবার একমাত্র উপায়—একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা, সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা—তাঁহার সম্পূর্ণ শাসন বহন করাতে অপমান-জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করা।

দশে মিলিয়া যেমন করিয়া বাদ-বিবাদ করা যায়... দশে মিলিয়া ঠিক তেমন করিয়া কাজ করা চলে না। ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সহজ...কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই।

অর্থ চাই...কিন্তু অর্থ আসবে কি করে! রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্প পরিমাণেও স্বদেশের জন্য কিছু উৎসর্গ করিবে। তাছাড়া প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্ম্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশী সমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দুরূহ মনে হয় না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থের অভাব ঘটিবে না।

আজ স্বাধীন ভারতে পঞ্চায়েৎ-প্রথার প্রবর্ত্তনের কথা উঠেছে। এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্ব্বে বলে গিয়েছেন—ইংরেজের আইন আমাদের সমাজ-রক্ষার ভার

লইয়াছে। পূর্ব্বকালে সমাজবিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া অবশেষে সমাজের সঙ্গে রফা করিত। সেই রফা অনুসারে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত।

যেদিন কোনো পরিবারে সন্তানদিগকে চালনা করিবার জন্য পুলিশম্যান ডাকিতে হয়, সেদিন আর পরিবার রক্ষার জন্য চেষ্টা কেন? সেদিন বনবাসই শ্রেয়।

কংগ্রেসের প্রতিনিধি-নির্বাচন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত— যখন দেশের মনটা জাগিয়া উঠিয়াছে, যখন দেশের কর্ম্মে সেই মনটা পাইতে হইবে, তখন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন কালে সত্যভাবে দেশের সম্মতি লইতে হইবে। এইরূপ শুধু নির্ব্বাচনের নহে, কংগ্রেস ও কনফারেন্সের কার্য্যপ্রণালীর বিধিও সুনির্দ্দিষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে।

এবং দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা…হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—যে রাজপ্রসাদ আমরা একদিন ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানের ভাগে পড়ুক—ইহা যেন আমরা সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাদের সীমা যেখানে-সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন, বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না…যখন বুঝিবেন, শক্তি লাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব…যখন জানিবেন যে, এক দেশে আমরা

জন্মিয়াছি···সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্ম্মহানি এবং ধর্ম্মহানি হইলে কখনই স্বার্থরক্ষা হয় না··· তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টায় মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।

দেশ, এবং স্বজাতির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এত কথা লিখেছেন যে তার মধ্য থেকে কালোপযোগী কথাগুলি সংগ্রহ করলেও মোটা একখানি গ্রন্থ হয়। তবু আরো কিছু কথা উদ্ধৃত করে এ-বক্তব্য শেষ করি। আমাদের তখনকার দিনে কর্ত্তব্য কি···সে সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—

এ-দেশের যে-ধন লইয়া পৃথিবীতে ব্রিটিশ ঐশ্বর্য্যের চূড়ায় উঠিয়াছেন···সেই ধনের রাস্তায় আমরা একটা সামান্য বাধা দিলেও তাঁহারা তো আমাদিগকে সহজে ছাড়িবেন না। এমন অবস্থায় যে সংঘাত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, তাহা খেলা নহে—তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে! ইহার উপরেও যাঁহারা অনাহত ঔদ্ধত্য ও অনাবশ্যক উচ্চ বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাদের কর্ম্মের দুরূহতাকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা কি দেশের কাছে অপরাধী নহেন? কাজের কঠোরতাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিব···কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিব না; দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে স্বাধীন করিয়া নিজের শক্তি অনুভব করিব ও দেশের বিদ্যা-শিক্ষাকে স্বায়ত্ত করিব, সমাজকে দেশের কর্ত্তব্য

সাধনের উপযোগী বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব! ইহা করিতে গেলে ঘরে ঘরে দুঃখ ও বাধার অবধি থাকিবে না···সেজন্য অপরাজিত চিত্তে প্রস্তুত হইব; কিন্তু বিরোধকে বিলাসের সামগ্রী করিয়া তুলিব না। দেশের কাজ নেশার কাজ নহে—তাহা সংযমীর দ্বারা, যোগীর দ্বারা সাধ্য।

একটা কথা উঠেছিল এবং এখনো অনেকের মুখে শুনি—সহযোগিতা-বর্জ্জনের কথা রবীন্দ্রনাথ তেমন করে বলেননি—সে-কথা ঠিক নয়। যাঁরা এমন কথা বলেন, তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং রবীন্দ্র-সাধনার মর্ম্ম বোঝেননি। তিনি গভর্ণমেণ্টের দিক থেকে মুখ ফেরাবার কথা নানাস্থানে, নানাভাবে বলেছেন—ভ্রুকুটি-কুটিল এবং ভিক্ষা-দ[illegible]··দুরকম মুখই ফেরাতে হবে। রাগের সহযোগিতা-বর্জ্জন নয়···সত্যকার সহযোগিতা-বর্জ্জনের মূল তত্ত্ব তাঁর মতো আর কেউ বোঝেননি। তিনি বলেছিলেন—আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই নন···সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়াই লইতে হইবে। সমাজ যে কর্ম্ম সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম্ম সম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে। অন্যায় এবং অধর্ম্মের সঙ্গে সংস্রব বর্জন এবং তার বিরোধিতাই তিনি চিরদিন করেছেন।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

তাঁর সমস্ত লেখা থেকে তাঁর বক্তব্য বেশ বোঝা যায়। সে বক্তব্য—গভর্ণমেণ্ট কি করেন, না করেন···সেদিকে দৃকপাত মাত্র না করে আমাদের সমস্ত কাজ নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে। তার জন্য আমাদের জাতীয় শক্তির কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। আমাদের পক্ষে এইটেই হবে আমাদের আসল গভর্ণমেণ্ট। আমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের শক্তি যত বেড়ে উঠবে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের শক্তি ততই হ্রাস পাবে। শেষে এমন অবস্থা আসবে নিশ্চয়···যখন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট হয় বিদেশী গভর্ণমেণ্টকে গ্রাস করবে, না হয় দুপক্ষে সম্মানজনক রফার ব্যবস্থা হবে। মহাত্মাজীর অসহযোগ-আন্দোলনের এইটিই ছিল লক্ষ্য।

জালিয়ানওয়ালা-বাগের সে নির্ম্মম-অত্যাচারের সময় কবি রবীন্দ্রনাথের যে-তেজ, যে-সঙ্গত উষ্মা প্রকাশ পেয়েছিল, তা থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমের যে-পরিচয় পাই, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা কোথায়?

এগারো

দিগ্বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঃ তেজস্বী রবীন্দ্রনাথ

যিনি নোবেল-পুরস্কার পান…তাঁর উপর পুরস্কার-দাতার একটি দাবি আছে…সে-দাবি—পৃথিবীর নানা দেশে গিয়ে তাঁকে সাহিত্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা বা প্রচার-কাজ করতে হবে। সে-দাবি মেনে এবং যে-সব দেশ থেকে সাদর নিমন্ত্রণ আসতো …তিনি সে-সব দেশে গিয়েছিলেন। এভাবে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য বহু রাজ্যে বারবার গিয়েছিলেন…শুধু পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে নয়…প্রাচ্য ভূখণ্ডেও তিনি চীন, জাপান, যব-বলি, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে এবং ভারতের দক্ষিণে সিংহলেও গিয়েছিলেন। কোনো সার্বভৌম নৃপতিও এমনভাবে পৃথিবী পর্যটন করেননি; এবং রবীন্দ্রনাথ যেখানে যেখানে গিয়েছেন, সেইখানেই রাজার অধিক সম্মান-সমাদর লাভ করেছেন—যেন অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী সম্রাট! যেখানে পদার্পণ করেছেন, সেইখানেই বিজয়লক্ষ্মী তাঁর কণ্ঠে পরিয়েছেন পরম প্রীতিভরে বিজয়মাল্য! সে-সব কাহিনী সবিস্তারে বলতে গেলে দু-চার খণ্ড গ্রন্থ লেখা ভিন্ন বলা যায় না। তাঁর জীবনের শেষ ক-পরিচ্ছেদের কথা আমাদের সংক্ষেপে বলতে হবে—তাঁর বিরাট শক্তি কি মহিমায় প্রকাশ পেয়েছিল…তার একটু পরিচয়ও তাহলে তা থেকে সকলে উপলব্ধি করতে পারবেন।

১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন ইতালীতে—সঙ্গে পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। ইতালীর সর্ব্বময় অধ্যক্ষ তখন মুসোলিনী। মুসোলিনী তাঁর অভ্যর্থনার জন্য রাজার মতো ব্যবস্থা করেছিলেন। মুসোলিনী বলেছিলেন—তিনি যে সুযোগ পেলেন to see the work of one who is assuredly a great man and a movement that will be certainly remembered in history. রোমে তিনি Eternal Cityর বিপুল সম্বর্দ্ধনা-সমাদর লাভ করেছিলেন ...সেখানে তাঁর 'চিত্রা' নাট্যের (ইতালীয়ান-অনুবাদ) অভিনয় দেখেছিলেন...মুসোলিনীর সঙ্গে বসে। ইতালী থেকে ইংলণ্ডে আসেন ; তারপর তিনি যান নরওয়েতে (১৯২৬...অগষ্ট)... সঙ্গে গিয়েছিলেন লর্ড সিংহ, প্রশান্ত মহলানবীশ এবং মহলানবীশের পত্নী রাণী মহলানবীশ। নরওয়ের রাজা করেন তাঁর সম্বর্দ্ধনা! নরওয়ে থেকে জার্মানি (সেপ্টেম্বর ১৯২৬)—জার্মানির হামবুর্গ, বার্লিন—প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ করেন তাঁর সম্বর্দ্ধনা ; তারপর ড্রেসডেন, কলোঁ... চেকোশ্লোভাকিয়া...প্রাহা...তারপর হাঙ্গারি...বুদাপেস্ত...বুল-গেরিয়া...গ্রীস। গ্রীস থেকে মিশর...কায়রোয় আসেন ১লা ডিসেম্বর ; তাঁর সম্মান-অভ্যর্থনার জন্য মিশরী পার্লামেণ্টের ছুটি থাকে এবং মিনিষ্টাররা তাঁর সম্বর্দ্ধনা করেন। তারপর ফেরেন ভারতবর্ষে আরব পর্য্যটন করে। আরব-রাজ ফুয়াদ

বিশ্বভারতীর জন্য তাঁকে বহু আরবী পুস্তক উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর প্রত্যাবর্ত্তন-প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে সংবাদ বেরিয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন not as a tyrant, not as a teacher—the bearer of a new message of synthesis and harmony, culture and enlightenment.

তিনি এসে নামলেন কলকাতায়। কলকাতার মেয়র তখন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। হাওড়া ষ্টেশনে তাঁকে বিপুল সম্মানে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গেলেন।

শান্তিনিকেতনে এসে তিনি লিখলেন 'নটীর পূজা'; এবং এই বছরেই দিল্লীতে…বড়দিনের সময়…দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে—ঘাতকের অস্ত্রে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হলেন নিহত। এ-সংবাদে রবীন্দ্রনাথ মর্ম্মাহত হলেন এবং শান্তিনিকেতনে এক সভায় অসহায় দুর্ব্বলের উপর শক্তিমানের এই বর্বর পীড়নের বহু নিন্দা করে তিনি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব এবং সম্প্রীতি না হলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য।

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে হলো "নটীর পূজা"র অভিনয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এ-অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তারপর ফেব্রুয়ারি মাসে…তখন বেঙ্গল অর্ডিনান্স আইনের

চাপে বহু নিরীহ তরুণের বিনা-বিচারে কারাদণ্ড-ভোগ হচ্ছে! তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি প্রবন্ধ পাঠ করেন। গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি বাঙলা গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ক'রে সেগুলির প্রকাশ এবং প্রচার বন্ধ করেছিল। তার বিরুদ্ধেও তিনি তীব্র প্রতিবাদ তুলেছিলেন; কিন্তু বুঝলেন, এ-প্রতিবাদ নিষ্ফল! গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী হয়েছে—তাকে নিরস্ত বা নিবৃত্ত করার প্রয়াস সম্পূর্ণ মিথ্যা হবে। তিনি তখন শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন; ফিে গিয়ে তিনি কাব্য, সঙ্গীত এবং নাট্য-রচনায় মনঃসংযোগ করলেন। নৃত্য-নাট্য রচনার উদ্যোগ এই সময়েই। ১৯২৭ মার্চ মাসে শান্তিনিকেতনে হলো তাঁর 'নটরাজ' নাটিকার অভিনয়—নূতন ধরণের নৃত্য-নাট্য নটরাজ।

এবং তারপর 'বিচিত্রা' মাসিকপত্র প্রকাশিত হলে 'বিচিত্রা'য় তিনি বহু গান, বহু কবিতা এবং তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'যোগাযোগ' (প্রথমে নাম দিয়েছিলেন তি৹পুরুষ··· পরে এ-নাম বদলে 'যোগাযে'গ' নাম দেন) ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।

১৯২৭ সালে জুলাই মাসে শ্যাম, বলিদ্বীপ এবং যবদ্বীপ যাত্রা করেন—রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা·দেবী ছাড়া সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ কর এবং আরো অনেকে এ যাত্রায় তাঁর সাথী হয়েছিলেন। এ-যাত্রার ব্যয় হিসাবে বিড়লা

দিয়েছিলেন দশ হাজার টাকা। যাত্রাপথে প্রথমে তিনি নামেন সিঙ্গাপুরে···তার পর মলক্কা, পেনাঙ, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ, সৌরবায়া—বরবদরের মন্দির দর্শন করে বানডুঙ এবং ব্যাটাভিয়া ঘুরে তিনি আসেন শ্যামে। শ্যামের রাজা, রাণী এবং চাম্তাবুলের যুবরাজ তাঁকে বিপুল সমাদরে সম্বর্দ্ধিত করেন।

১৯২৮ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ আবার বিলাত যাত্রা করেন···অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেকচার দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে।···কিন্তু পথে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন এক হপ্তা তিনি মাদ্রাজে আদেয়ারে বিশ্রাম করেন মিসেস আনি বেসান্তের অতিথি হয়ে। সুস্থ হবামাত্র তিনি যাত্রা করেন কলম্বোয়·· পথে পণ্ডিচেরীতে (২৯ মে···১৯২৮) শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যান। সিংহলেও বিপুল সম্বর্দ্ধনা এবং সিংহল থেকে ফেরবার পথে বাঙ্গালোরে আসেন। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীল তখন ভাইস চান্সেলর; তাঁর আমন্ত্রণে তাঁর গৃহে রবীন্দ্রনাথ অতিথি হন এবং বাঙ্গালোরে বসেই তিনি লিখলেন তাঁর শেষ উপন্যাস···শেষের কবিতা।

১৯২৯ সালে কানাডার National Council of Education-এর নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ কানাডা যাত্রা করেন··· (২৬ ফেব্রুয়ারি) এ-যাত্রায় সাথী ছিলেন অপূর্ব্বকৃষ্ণ চন্দ।

যাত্রাপথে জাপানের টোকিও শহরে ছিলেন দুদিন ; তার পর টোকিও ত্যাগ করে ভাঙ্কুবার···সেখানে কটি বক্তৃতা দিতে হয়। ভাঙ্কুবার থেকে কানাডায় গিয়ে বক্তৃতা দেন। সেখানে থাকবার সময় হার্ভার্ড, কলম্বিয়া, কালিফোর্নিয়া এবং ডেট্রয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে তিনি আসেন লশ এঞ্জেলেসে···১৮ই এপ্রিল। এখানে পৌছে তিনি দেখেন, পাশপোর্ট হারিয়ে গিয়েছে। তিনি এসিয়াটিক···এজন্য এমিগ্রেশান্ অফিসারের যে-ব্যবহার লক্ষ্য করেছিলেন···রাগে তিনি এসব নিমন্ত্রণ খারিজ করে কানাডা-পরিক্রমা বর্জ্জন করে জাপানে ফিরে আসেন ২০ এপ্রিল। টোকিওতে তিনি প্রাচ্য সভ্যতা এবং জাপানের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার খুব সমাদর হয়েছিল।

ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ আবাব সাহিত্য-রচনায় মনোযোগী হলেন। ১৯২৯ সালে লিখলেন তাঁর সাহিত্যের স্বরূপ এবং সাহিত্যের বিচার—প্রবন্ধ দুটি। এ দুটি প্রবন্ধ তিনি পাঠ করেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের-প্রতিষ্ঠিত Tagore Society বা রবীন্দ্র-পরিষদ সভার দুটি অধিবেশনে। তার পর কিশোর বয়সে লেখা রাজা ও রাণী নাটিকাটিকে ভেঙ্গে-চুরে নূতন নাটক লিখলেন 'তপতী'। এ-নাটকের অভিনয় হলো জোড়াসাঁকোর বাড়ীর প্রাঙ্গণে···তিন সন্ধ্যায়—১৯২৯ ···২৬, ২৮ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর। তিনটি অভিনয়েই প্রাঙ্গণ

লোকে লোকারণ্য। শহরের সাহিত্য-রসিক সুধী, ধনী, গুণী, ছাত্র-ছাত্রীদের কি ভিড়! বহু লোক স্থানাভাবে অভিনয় দেখবার সুযোগ হারিয়ে কত কাতর হয়েছিলেন, সে-দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছি। এ-অভিনয়ে আমরা দু-চার জন ভলাণ্টিয়ারি কাজও করেছিলুম।

অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ…তখন বয়স প্রায় সত্তরের কাছে… তিনি নেমেছিলেন রাজা বিক্রমদেবের ভূমিকায়। তরুণ রাজার ভূমিকায় বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ—অঙ্গের ভঙ্গীতে বাচনে কে বলবে, বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ! মেক-আপে কতখানি জ্ঞান থাকলে এমন সজ্জাভূষণ করা যায়…ভাবলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না!

৬০ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হলে রবীন্দ্রনাথকে সে-জন্মোৎসবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মারফত বিশেষ অভিনন্দন দেওয়া হয়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'আশীর্বচন' প্রশস্তি উপহার দেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন —শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ, তুমি যখন বালক, তখন হইতেই তোমার কবিতায় বাঙালী মুগ্ধ। তোমার যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তোমার প্রতিভা বিকাশ হইতে লাগিল। সে-প্রতিভা যেমন দেশ হইতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তেমনি সাহিত্যেরও সকল মূর্ত্তি আয়ত্ত করিতে লাগিল। সে প্রতিভা ক্রমে গদ্য, নাটক, নভেল, রচনা, ছোট গল্প, সমালোচনা,

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি···এইরূপে সমস্ত সাহিত্য-সংসারে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তুমি সাহিত্যের যে-মূর্ত্তিতেই হাত দিয়াছ, তাহাকে উদ্ভাসিত ও সজীব করিয়া তুলিয়াছ। তোমার যেমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে, তেমনি দূরদৃষ্টি আছে·· তোমার গুণে বাঙ্গালা তো চিরদিনই মুগ্ধ, ভারত গৌরবান্বিত। এখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম, নূতন ও পুরাতন সকল মহাদেশই তোমার প্রতিভায় উদ্ভাসিত।

এই বছরেই জাপানী জিউজিৎসু-কুশলী প্রসিদ্ধ প্রোফেসর তাকানাবি শান্তিনিকেতন দেখতে আসেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের ব্যায়ামচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করছিলেন—তাঁকে তিনিই আনিয়েছিলেন জাপান থেকে নিমন্ত্রণ করে—তাঁর হাতে রবীন্দ্রনাথ দিলেন ছাত্রছাত্রীদের ব্যায়াম-শিক্ষার ভার।

১৯৩০ সালের মার্চ মাস পড়তেই রবীন্দ্রনাথের একাদশ সফর—মার্শেল্‌স্ হয়ে মন্টিকার্লোর কাছে ক্যাপ মার্ত্তায়··· চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্টের অতিথি হলেন। তিনি লণ্ডনে আসেন ১১ মে···সেখান থেকে বার্মিংহামে এসে সংবাদ পেলেন—ভারতবর্ষে দারুণ ব্যাপার···মহাত্মা গান্ধির লবণ আন্দোলন···দাণ্ডি মার্চ···মহাত্মাকে গ্রেফতার করে অন্তরীণ রাখা হয়েছে···শোলাপুরে মার্শাল আইন জারি হয়েছে এবং বড়লাটের অর্ডিনান্সের বলে কংগ্রেসকে 'বে-আইনী' গণ্য করা

হয়েছে। সেই সঙ্গে ইংরেজের উস্কানিতে ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানে বেধেছে ভয়ানক দাঙ্গা।

১০ই মার্চ তারিখে তিনি 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জেন' পত্রের সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন against the repressive measures by the bueurocratic Government—গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে; সেই সঙ্গে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সুধীজনের কাছে এর বিচার এবং প্রতিকারের প্রার্থনাও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—the present complications cannot be dissipated by repression and a violent display of physical power. তার পর লণ্ডনে এসে তখনকার ভারতসচিব ওয়েজউড বেনের সঙ্গেও এ-ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছিলেন; এবং কোয়েকার সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের নির্মম পীড়নের কথা তুলে বলেছিলেন—Realise yourselves in our place and recall the time when your own brothers in America wanted to secure their freedom with their blood.

লণ্ডন থেকে তিনি আবার অক্সফোর্ডে আসেন…তার পর তিনি যান জার্মানি…জার্মানি থেকে ডেনমার্ক, জেনেভা; এবং

জেনেভা থেকে সোভিয়েট রাশিয়া…তার পর আবার ফিরতি-মুখে ইংলণ্ড। সেখানে গোল-টেবিল বৈঠকে ভারত সম্বন্ধে আলোচনাদি করে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

কলকাতায় তখন দেশবাসী তাঁকে বিপুল সমারোহে অভ্যর্থনা করেছিল। এর পর তাঁর সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম-কালে সম্বর্দ্ধনা হয় কলিকাতার তরফ থেকে। কলিকাতার মেয়র তখন ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর সম্বর্দ্ধনায় বিধানচন্দ্র যে প্রশস্তিপত্র দান করেন, তাতে কলকাতার তরফ থেকে লিখিত হয়েছিল—

বিশ্ববরেণ্য মহাভাগ,

…এই মহানগরী তোমার জন্মস্থান এবং তোমার যে কবি-প্রতিভা সমস্ত সভ্য জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে, এই স্থানেই তাহার প্রথম স্ফুরণ। তোমার অভিনব কল্পনা-প্রসূত শিক্ষার আদর্শ বাঙলার নিভৃত পল্লীকে বিশ্বমানবের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে এবং তোমার লেখনী-নিঃসৃত অমৃতধারা বাঙ্গালী জাতির প্রাণে লুপ্তপ্রায় দেশাত্মবোধ সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে মাতৃপূজার প্রধান পুরোহিত, হে বঙ্গ-ভারতীর দিগ্বিজয়ী সন্তান, হে জাতীয় জীবনের জ্ঞানগুরু, আমরা তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। বন্দে মাতরম্।

সাহিত্য পরিষদ থেকেও সম্বর্দ্ধনা হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কটি ছত্র…ছত্রগুলি তিনি লিখেছিলেন… রবীন্দ্রনাথ যখন পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছিলেন—সে কটি ছত্র মনে পড়ছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

সেই সে বালক সেদিনকার
পঞ্চষষ্টি হইল পার।
কাণ্ডটা কি চমৎকার!
চমৎকার! চমৎকার!

১৯৩১ সালে বাঙলা দেশের পণ্ডিতসমাজ সংস্কৃত কলেজে এক বিশেষ সভা আহ্বান করে রবীন্দ্রনাথকে 'কবি-সার্বভৌম' উপাধিতে ভূষিত করেন (১৩ ডিসেম্বর), এবং সম্বর্দ্ধনা করে গ্রন্থাদি উপহারের ব্যবস্থা হয়। এ-উৎসবের পর রবীন্দ্রনাথ স্থির করেছিলেন, তিনি দার্জিলিংয়ে যাবেন এবং দার্জিলিংয়ে গিয়েছিলেন। এদিকে প্রচণ্ড ব্যাপার ঘটলো। কলকাতার ঐ বিশেষ সম্বর্দ্ধনার সংবাদ পেয়ে…বেআইনী আইনের প্রতাপে বাঙ্গালার যে-সব নির্দোষ নিরপরাধ সন্তান হিজলী-ক্যাম্পে বন্দী ছিলেন, তাঁরা তাঁর নামকীর্ত্তন করে মিছিল বার করেন। তখন ক্যাম্পের ইংরেজের খয়ের-খাঁ অমানুষ পাহারাদাররা বেপরোয়া গুলি চালিয়ে অনেককে হত্যা করে। এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন…পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন ষ্টেট্স্‌ম্যান

পত্রে ছাপাবার জন্য···কিন্তু সম্পাদক সে-পত্র না ছাপিয়ে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং থেকে হিজলীর সন্তানদের প্রত্যভিনন্দন লিখে পাঠিয়েছিলেন···কিন্তু ইংরেজ সেন্সর সেটি হিজলীতে না পাঠিয়ে ফেরত দেয়। সে-কবিতাটি পরে প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সে কবিতাটি—

প্রত্যভিনন্দন

বক্সা দুর্গস্থ রাজবন্দীদিগের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে উন্মুখর ঊর্দ্ধ স্রোতে
বন্দী বারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন।
মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি
স্বসমুত্থ শক্তি বলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর কী রব লভিল বীর—
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্ত্য করের রাজধানী।
অমৃতের পুত্র মোরা—কাহারা শুনালো বিশ্বময়—
আত্মবিসর্জ্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়?
ভৈরবের আনন্দেরে দুখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তির কে দিল পরিচয়!

১৯শে জ্যৈষ্ঠ — শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩৩৮ — দার্জিলিং

১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ পারস্য যাত্রা করেন। পারস্যের সম্রাট তাঁকে বহু সম্মানে অভ্যর্থনা করেন এবং পারস্যে তাঁর সমাদর-শ্রদ্ধার সীমা ছিল না।

১৯৩৬ সালে কমুনাল এ্যাওয়ার্ডের পর্ব···বাঙলার হিন্দুদের উপর দারুণ অবিচারের পর্ব···টাউন হলে জনসভা হলো প্রতিবাদ-কল্পে; এবং রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদীপক্ষে এ-আন্দোলনে অগ্রণী হয়ে প্রতিবাদপত্রে নাম স্বাক্ষর করেন। রাজনীতিক স্বার্থসেবীর দল হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—ছি ছি, রবীন্দ্রনাথ কবি, তাঁর এখন জগৎজোড়া যশ-মান···তিনি কেন এ-সব দলে মিশে নিজের অমর্য্যাদা করবেন! সে-কথায় রবীন্দ্রনাথ কর্ণপাত করেননি···তিনি বহু যুক্তি দেখিয়ে এই এ্যাওয়ার্ডের গলদ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-উৎসবে রবীন্দ্রনাথকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করা হয় অভিভাষণ দেবার জন্য।

১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্ত্তন সভার অধিবেশন হয় শান্তিনিকেতনে (৭ই অগষ্ট) এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সে-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস স্যর মরিস গায়ার···স্যর রাধাকৃষ্ণন এবং বিচারপতি হেণ্ডারশন রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ লিটারেচার উপাধিতে বিভূষিত করেন।

এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যভঙ্গ হতে থাকে এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁকে কলকাতায় এনে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসাধীনে রাখা হয়। নভেম্বর মাস নাগাদ তিনি কতক সুস্থ বোধ করেন···তখন ১৮ই নভেম্বর তিনি আবার শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন···কিন্তু দুমাস পরে আবার তিনি আসেন কলকাতায়।

১৩৪৮ সালে ১লা বৈশাখ (১৯৪১···১৪ই এপ্রিল) শান্তিনিকেতনে তাঁর একাশি বৎসর বয়সের জন্মোৎসব করা হয়। এ-উৎসবে তিনি 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধ পাঠ করেন। সে-প্রবন্ধের উপসংহার-ভাগে তিনি লিখেছিলেন—

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কেমন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে···কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলাম ইউরোপের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে···আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে-বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল! আজ আশা করে আছি···পরিত্রাণ-কর্ত্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকবো সভ্যতার

যে দৈববাণী সে নিয়ে আসবে। মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি···পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম! ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট···সভ্যতাভিমানের কী পরিপূর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ···সে-বিশ্বাস শেষ পর্য্যন্ত বহন করবো। আশা করবো, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে···এই পূর্ব্বাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে···আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্য্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাবো, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতামদ-মত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয়, তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে···নিশ্চিত এ-সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততো সপত্নানজয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

রবীন্দ্রনাথের এ-কথায় মনে পড়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সেই কথা—যেমন তোমার অন্তর্দৃষ্টি···তেমনি

দূরদৃষ্টি! বহু মহাপুরুষ বহু দেশের ভাগ্য গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছেন···কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো বিধাতা পুরুষের মতো ভাগ্যের ইঙ্গিত কে আর দান করেছেন!

এই জন্মতিথি উৎসবে ত্রিপুরেশ্বর তাঁকে 'ভারতভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। এ-জন্মোৎসবের পর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য অতি দ্রুত ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হতে থাকে। তবু লেখা চলেছে সমানে···সেই সঙ্গে দেশের চিন্তা···স্বদেশবাসীর চিন্তা। এবং তিনি রোগশয্যায়, তখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যা কুমারী রাথবোন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমর্থন করে, ভারতবাসীকে অকৃতজ্ঞ বেইমান বলে কটূক্তি দিয়ে এবং ভারতবাসীর স্কন্ধে অপরাধের বোঝা চাপিয়ে এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করেছিলেন। রোগশয্যায় শায়িত রবীন্দ্রনাথ সে লেখা পড়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন এবং রোগশয্যায় শুয়েই এ-পত্রের যে-উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে রবির রুদ্রতেজ ছিল পরিপূর্ণ গরিমায়!

যে-ইংরাজ দুই শতাব্দী ধরিয়া আমাদের টাকার থলি হস্তগত করিয়াছে···আমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে···সে ইংরাজ আমাদের দীন-দরিদ্রদের জন্য কি করিয়াছে? চারিদিকে তাকাইয়া আমি দেখিতেছি, জীর্ণ দেহে তাহারা অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এক ফোঁটা পানীয় জলের প্রত্যাশায় আমাদের দেশের মেয়েরা

পঙ্ক কর্দ্দম খুঁড়িয়াও জল পাইতেছে না—ভারতবর্ষে স্কুলের চেয়ে কূপের সংখ্যা আরো অল্প। আমাদের অন্ন মেলে না… অথচ শাসনের চাপে ইংরাজ আমাদিগকে অহরহ নিগৃহীত করিতেছে—সেজন্য আমরা ইংরাজের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব? মিস রাথবোন চান…আমরা তাঁর জাতির করচুম্বন করিব? * * * * এ-পত্রের শেষাংশে তিনি লিখেছিলেন—কোন সরকারের মুখপাত্র যাহা বলেন…তাহার দ্বারা ঐ সরকারের বিচার করা যায় না। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ঐ সরকার প্রকৃতপক্ষে ফলপ্রদ কি সাহায্য করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াই উহাকে বিচার করা হয়। ব্রিটিশগণ বিদেশী বলিয়াই যে আমাদিগের নিকট অবাঞ্ছিত ও আমাদিগের হৃদয়ে স্থানলাভ করিতে পারে নাই তাহা নহে; আমাদিগের মঙ্গল ও স্বার্থরক্ষার ভার গ্রহণ করিবার ভাণ করিয়া তাহারা সেই মহাকার্য্যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে এবং দেশের মুষ্টিমেয় ধনিকের পকেট স্ফীত করিবার জন্য ভারতে লক্ষ লক্ষ লোকের সুখশান্তি জলাঞ্জলি দিয়াছে। আমি মনে করিয়াছিলাম, শিষ্ট ইংরেজ অন্ততঃ এই সকল অবিচার সম্বন্ধে নীরব থাকিবে এবং আমাদিগের নিষ্ক্রিয়তার জন্য আমাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। কিন্তু আমাদিগের ক্ষতে ক্ষার ক্ষেপ করায় সে-শিষ্টতার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

রোগশয্যা—রোগশয্যা বলি কেন…অন্তিম শয্যা থেকেও সিংহের গর্জ্জন! এর তুলনা মিলবে না মহীমণ্ডলে!

এ-জাতির দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে, জাতিকে মানুষ করে তোলবার জন্য রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়…জ্ঞানচক্ষু হারা জাতির চোখ ফুটিয়ে দৃষ্টিদানের জন্য জীবমাতার সাধনা—শুধু ভারতের ইতিহাসে নয়, জগতের ইতিহাসেও দুর্লভ বললে অত্যুক্তি হবে না।

বারো

নানা কথা

আজ রবীন্দ্রনাথের জীবনের দিকে চেয়ে দেখলে তাঁর জীবনের আনুপূর্ব্বিক যে পরিচয় পাই…সংক্ষেপে তা বলে আমার এ-বক্তব্য শেষ করবো।

তিনি শুধু ভাবরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন না…বিশ্বের অন্তরকে তিনি জানতেন অন্তর্যামীর মতো—একদিকে ভাবরাজ্যের অধীশ্বর…অপরদিকে তেমনি বিরাট কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন তিনি।

তাঁর বাণী আমাদের প্রতি নিমেষকে যেমন পরিপূর্ণ রেখেছে …ভাবীকালের সর্ব্বজীবকেও তেমনি সে-বাণী প্রাণের প্রবাহে জীবন্ত রাখবে! ভাষায় ভাবে শক্তি এবং যুক্তি—তিনিই এনেছেন…তাঁর সকল সাহিত্যে যে intellect-এর পরিচয় পাই…এমন পরিচয় বিশ্বের কোনো সাহিত্যের কোনো বিভাগেই নেই!

বাঙলা-সাহিত্যের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র…তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-সাহিত্যের কত নূতন দিক খুলে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ! ছোট গল্প—বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই তার সৃষ্টিকর্ত্তা। ছোট গল্প লেখার কাহিনী তাঁর মুখে যা শুনেছি…সে-কাহিনী অপূর্ব্ব!

১৮৯৪ সাল…তাঁর বয়স তখন ত্রিশ-একত্রিশ বছর… শিলাইদহে জমিদারী-কাজ দেখতেন…থাকতেন বজরায়। সেই সময়ের কথা—তিনি একখানি পত্র লিখেছিলেন। সে পত্রে লিখেছিলেন—আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোট ছোট গল্প লিখতে বসি, তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি…এবং কৃতকার্য্য হতে পারলে পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই যে, যাদের কথা লিখব…তারা আমার দিন-রাত্রির অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে…আমার একলা মনের সঙ্গী হবে…বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের সঙ্কীর্ণতা দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনা-রাজ্যে অবতারণা করা গেছে।

এমনি ভাবে "মেঘ ও রৌদ্র" গল্পের সৃষ্টি। তার দু'বছর আগে সাজাদপুরের কুঠিতে একদিন গ্রামের পোষ্টমাষ্টার

এসেছিলেন—তাঁকে উপলক্ষ করে 'পোষ্টমাষ্টার' গল্প, 'সমাপ্তি' গল্প, 'ছুটি' গল্প তিনি এই সময়েই লেখেন। 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটির সম্বন্ধে তাঁর মুখে শুনেছিলুম···তিনি বলেছিলেন—পোষ্টমাষ্টার-মশাইয়ের সঙ্গে আলাপ হলো···তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, কোথায় ঘর···কোথায় স্ত্রী-পুত্র-পরিবার···একা থাকেন বহুদূর এই গ্রামে···রান্নাবান্না প্রভৃতির কাজ করে ছোট একটি মেয়ে···মেয়েটিরও কেউ কোথাও নেই···অনাথা···কাজে তার খুব নিষ্ঠা···অত্যন্ত যত্ন করে···যেন আমার কত আপনজন—মায়ের স্নেহ, বোনের ভালোবাসা···সব পাই তার কাছে···তাই কোনোমতে বেঁচে আছি। এই কাহিনীটুকু শুনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন তাঁর পোষ্ট-মাষ্টার গল্প।

তিনি বলতেন—এমনি করেই গ্রামের কত রকমের মানুষের সঙ্গে হতো পরিচয়···তাদের সুখ-দুঃখ তারা অসঙ্কোচে প্রকাশ করতো। তাদের সঙ্গে এই পরিচয়ই আমাকে দিয়েছে প্রেরণা। কত অজানাকে জেনেছি এমনি করে—অতি-জানার মতো। আমাদের বলতেন—জীবনের এক এক টুকরো, এর উপরেই ছোট গল্প গড়ে তোলো। আকাশে যেমন প্রাসাদ গড়া যায় না···গল্প বলো, উপন্যাস বলো, নাটক বলো ···তেমনি নিছক কল্পনায় গড়ে তোলা যায় না। বাস্তবকে চাই ভিত্তি। Airy nothing কথাটা শুনতে ভালো···কিন্তু তাকে মূলধন করে গল্প উপন্যাস লিখতে গেলে জীবনের স্পর্শ থাকবে

না সে-সব রচনায়। এ-কথা কত সত্য, তাঁর প্রত্যেকটি গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে আমরা চিরদিন পেয়েছি সে-পরিচয়।

তাঁর খুব ছোট বেলায় লেখা 'রাজর্ষি', 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস দুটির প্রসঙ্গ তুলেছিলুম তাঁর কাছে। বলেছিলুম—রাজর্ষিতে যখন পড়ি, গোবিন্দমাণিক্য জেনে ফেলেছেন··· নক্ষত্র রায় তাঁকে হত্যা করতে অভিলাষী···বলেছিলুম—অন্য-সব উপন্যাসে যেমন পড়ি ··ভেবেছিলুম, রাজা গোবিন্দমাণিক্য জল্লাদকে ডেকে বলবেন—মশানে নিয়ে গিয়ে ওর গর্দ্দানা নাও! কিন্তু তা নয়···পড়লুম, নক্ষত্রকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে গোবিন্দমাণিক্য তাঁকে এ-কথাটুকু বললেন স্পষ্ট ভাষায়। তার পর তাকে বোঝানো···এক মায়ের পেটের ভাই···তাঁকে মারবে কি! এমনি নানা কথা বললেন। নক্ষত্র-মাণিক্যর কথায় তাঁকে বলেছিলুম—পড়ে মনে হয়েছে, এই তো ঠিক! রাজা রাজাই আছেন···কিন্তু রাজা হলেও তিনি বড় ভাই··· বইয়ে শুধু রাজার প্রতাপ দেখবো···রাজা আমাদের মতো মানুষ·· সে-মানুষটিকে পাবো না! রাজর্ষিতে রাজাকে পেয়েছি এবং সে-রাজাকে মানুষ-হিসাবেও পেয়েছি—যেমন হওয়া উচিত। এই কারণে, সমালোচকের দল যাই বলুক, 'রাজর্ষি' উপন্যাসকে চিরদিন আমি শিরোধার্য্য করে বলবো—বাঙলা উপন্যাসে পোষাকপরা অস্ত্রধারী রাজাকে শুধু পাইনি···বইয়ের রাজা নয়···মানুষ-রাজা পেয়েছি! এবং

কথা-সাহিত্যে জীবন্ত মানুষকে রবীন্দ্রনাথই সব-প্রথম এনে উপস্থিত করেছেন! বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ, হেমচন্দ্র, পশুপতি —এঁরা অপূর্ব্ব, মানি···কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমাদের এক পংক্তিতে বসবার দাঁড়াবার উপায় নেই! নগেন্দ্রনাথ কতকটা আপনজনের মতো···গোবিন্দলাল আরো আপনার ···তবু নগেন্দ্রনাথ এবং গোবিন্দলালের সঙ্গে আমাদের যেন কোথায় তফাত আছে বলে···মনে হতো! আর মহেন্দ্র— মহেন্দ্র আমাদের যেন অতি পরিচিত।

প্রথম যখন 'নষ্টনীড়' পড়ি···তখন আমাদের বয়স কুড়ির কোঠাতেও পৌছোয়নি। এ-গল্পটিতে যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ···সেই সমস্যাকে নগ্ন-রূপ দিয়ে বহু কথাশিল্পী সে-সমস্যা শুধু চূর্ণ করেননি···সে সমস্যার নগ্ন-রূপে কত কালি মাখিয়েছেন···মাখিয়ে যশ খ্যাতি লাভ করেছেন! ভূপতি এবং চারুর সম্পর্ক···সেকালে স্বামীদের বদ্ধমূল ধারণা—কোনো স্বামীকে স্ত্রীর উপর অধিকার অর্জ্জন করতে হয় না···স্ত্রী ধ্রুবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জ্বালিয়ে রাখবে···বাতাসে সে আলো নিববে না···তেলেরও অপেক্ষা রাখবে না! ভূপতি থাকেন নিজের কাজ নিয়ে···চারু নিঃসঙ্গ জীবনে পেলে দ্যাওর অমলের সাহচর্য্য—হাসি-গল্পের মধ্য দিয়ে দুজনের সম্পর্ক স্বাভাবিক সহজ সুন্দর হয়ে গড়ে উঠছে—ভূপতির ভালো লাগে···কিন্তু পরে অমলের হলো

সাহিত্য-রচনায় কীর্ত্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা, লোভ···অমলও সরে যাচ্ছে চারুর কাছ থেকে···চারুর মনে বেদনা—কি critical situation. পাঠকের ভয় হয়···বুঝি, কি অনর্থপাত না ঘটে! কিন্তু লেখকের সংযম-বুদ্ধি কি চমৎকার করেই না এ situationটুকু রক্ষা করলো। নীড় কিন্তু ভেঙ্গে গেছে··· এই suggestionটুকু আর্টের দিক দিয়ে অপূর্ব্ব। তবে এ-কথা ঠিক···'নষ্ট-নীড়' রচনায় স্বামীদলের মনে এ-কথা জাগবেই যে, বিবাহ করে স্ত্রীকে অবরুদ্ধ ঘরে ফেলে রাখা চলবে না···তাঁর দিকেও মনোযোগী থাকা চাই। স্বামীরা বুঝবেন, স্ত্রীর ভালোবাসা অর্জ্জন করতে হয় এবং সে ভালোবাসা রক্ষা করতে হলে নিজেকে সপ্রতিভ থাকতে হবে। স্ত্রী-পুরুষ— দুজনেরই মন আছে এবং সে-মন সজীব···ধ্রুবতারার আলো হলেও এ-আলোকে বাতাস বাঁচিয়ে রক্ষা করতে হয় এবং এ আলো জ্বালিয়ে রাখবার জন্য তেল সলিতারও প্রয়োজন।

উপন্যাসগুলিতে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ মানুষের নানা পরিচয় দিয়েছেন। এবং যদি বলি, তাঁর এ সব গল্প-উপন্যাস পড়ে অনেকে মনে চেতনা পেয়েছেন···নিজের দোষ-ত্রুটি বোঝবার সঙ্গে সঙ্গে অপরের সুখ-দুঃখ বোঝবার শক্তি লাভ করেছেন, তাহলে সে-কথা অস্বীকার করা চলবে না নিশ্চয়!

রবীন্দ্রনাথের এসব রচনা পড়ে কিশোর বয়সে আমি অতি দারুণ বিয়োগ বেদনা সহ্য করেছিলুম। সে-বেদনায় কারো

সান্ত্বনা আমাকে খাড়া করতে পারেনি···অত্যন্ত অস্থির চিত্ত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের তখনকার রচনায় (১৯০৫) একাগ্র মন নিয়োগ করেছিলুম এবং তাতে যে সান্ত্বনা পেয়েছিলুম···কৃতজ্ঞ চিত্তে কবির উদ্দেশে কবিতা লিখে তা জানিয়েছিলুম—দুঃখ-শোক যখন ঝড়ের মতো আমাকে চূর্ণ করতে উদ্যত হয়েছিল ···তখন সে-ঝড়ে—

শান্তিপূর্ণ সুধাস্নিগ্ধ পক্ষপুট মেলি
নিল মোরে ছায়ে তব কাব্য গ্রন্থাবলী !

সে-কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু আমার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—মন তোমার সুস্থ হোক !

১৯২৩ সালের অগষ্ট মাসে তিনদিন ২৫,২৭ এবং ২৮ তারিখে কলকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন 'বিসর্জ্জন' নাটকের অভিনয়। রবীন্দ্রনাথ নেমেছিলেন জয়সিংহের ভূমিকায়। কি আশ্চর্য্য মেক-আপ···আর কি সে অভিনয়! তাঁর বয়স তখন ষাট বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে···কিন্তু তরুণের মূর্ত্তি! তিনি যখন বলতেন—

দাঁড়ায়ে আছিস লোলজিহ্বা মেলি
রক্তৃষাতুরা···সন্তানের রক্তপান-লোভে···

তখন চোখের সামনে থেকে পটভূমি কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল···চোখের সামনে জেগে উঠেছিল···রক্তমাখা দীর্ঘ রসনা—রক্তৃষাতুরা রসনা! এই অভিনয়ে অর্পণা

বিচারপ্রার্থী হয়ে রাজার কাছে এসে বলেছিলেন—বিচ্-আ-র চ-আই! অর্থাৎ বিচার এবং চাই…দুটি কথা বেশ বিস্তারিত (stretch) করে টেনে! সে-সময়ে অনেকে এভাবে বলার অর্থ বোঝেননি…আমাদেরো একটু বিচিত্র-বোধ হয়েছিল। অভিনয় দেখে পরের দিন তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বলেছিলেন—ছোট মেয়ের এ-বিচার চাওয়ার মধ্যে আছে তার খেদ, ক্ষোভ, বিচারের তীব্র দাবী…তার সে-দাবী মানতেই হবে! সাদা সহজভাবে 'বিচার চাই' বললে মনের এ-ভাবগুলো প্রকাশ পাবে না। তাই কথাগুলো বিস্তারিত করে বলানো হয়েছে। তাঁর এ কথায় বুঝেছিলুম, অভিনয়ে কত দিকে লক্ষ্য রাখা চাই।

'বিসর্জ্জন' নাটকের রিহার্শালের সময় প্রচণ্ড এক কৌতুকের ব্যাপার ঘটেছিল…বলি। তা থেকে মানুষ রবীন্দ্রনাথের মানবচরিত্র-জ্ঞানের পরিচয় শুধু নয়…তাঁর কৌতুক জমাবার শক্তি ছিল কতখানি, তাও বোঝা যাবে।

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তখন প্রত্যহ সন্ধ্যার আগে থেকে বিসর্জ্জনের রিহার্শাল চলেছে…ও-সময়টায় আমাদের ভারতীর আসরে বন্ধুরা এসে জমায়েৎ হন। আমাদের এক বন্ধু… তিনি কবিতা লিখতেন…চেহারায় সুপুরুষ বলা যায় না…খর্ব্ব স্থূলদেহী…বয়স তখন তাঁর পঞ্চাশের কাছে—তিনি হঠাৎ ভারতীর আসরে দুর্লভ হলেন! ব্যাপার কি? অসুখ করেনি তো? না…মণিলাল বললেন—তিনি বিসর্জ্জনের রিহার্শাল এ্যাটেণ্ড করছেন। রবীন্দ্রনাথের কি খেয়াল হলো…তাঁকে উদ্দেশ করে অবনীন্দ্রনাথকে তিনি বললেন— এঁকে অপর্ণা সাজালে কেমন হয়? মেক-আপে পারো

তুমি সাজিয়ে তুলতে? ইনি কবি…এবং যে-রকম তন্ময়ভাবে রিহার্শাল দেখছেন—দরদ দিয়ে অভিনয় করতে পারবেন। এ-ইঙ্গিত অবনীন্দ্রনাথ বুঝলেন…বুঝে বললেন—পারি। তলপেট থেকে বুক পর্য্যন্ত টাইট-ব্যাণ্ডেজ তারপর এখানে রবারের প্রলেপ…ওখানে এমনি…ব্যস। তিনি তখন অপর্ণার ভূমিকায় রিহার্শাল দিতে লাগলেন। সকলে অবাক! অবশেষে যেদিন প্রথম-অভিনয়, তার আগের দিন প্রমাদ গণে রবীন্দ্রনাথ বললেন অবনীন্দ্রনাথকে—ও অবন, এখন এঁকে সরাবে কি করে? অবনীন্দ্রনাথ বললেন—সে আমি ঠিক করে দিচ্ছি। এর পর সেদিন আমাদের সে-বন্ধু রিহার্শালে আসতে অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন—বিপদ হয়েছে মশাই! যে-মেয়েটি অপর্ণা সাজবে ঠিক হয়েছিল…সে আজ সকাল থেকে এসে কবির পায়ে পড়েছে…সত্যাগ্রহ! বলে—'ও-পার্ট না পেলে সে অনশনে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে। রবীন্দ্রনাথ বিপদে পড়েছেন—কি করেন! আমি বলেছি—উনি chivalric…মেয়েটির এ-কথা শুনলে নিশ্চয় ও-পার্ট ছেড়ে দেবেন।…তা কি বলেন আপনি? আমাদের কবি-বন্ধু একটু হেসে বললেন—বেশ তাই, হোক!

আর একটি গল্প বলি—তখন রিষ্ট-ওয়াচের পশার খুব হয়েছে। দিনেন্দ্রনাথ একটি ভালো রিষ্ট-ওয়াচ কিনে সব সময়ে হাতে বেঁধে রাখেন…শুধু স্নানের সময় সেটি খুলে রাখেন—রাত্রে শোবার সময়েও সেটি হাতে বেঁধে শয়ন করেন। একদিন বিচিত্রার আসরে আমরা আছি…রবীন্দ্রনাথ গল্প বলছেন… দিনেন্দ্রনাথ সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে…রিষ্ট-ওয়াচটি নেড়েচেড়ে দেখছেন…রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ উঠে গিয়ে ডাকলেন—'দিনু…

দিনেন্দ্রনাথ তাঁর পানে তাকালেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন—সময়কে হাতে বেঁধে ভাবচো, তাকে আটকে রাখবে··· কিন্তু তা পারবে না···সময়কে বেঁধে রা খতে পারবে না।

কথা শুনে ঘরে আমরা হেসে ফুটিফাটা!

এমনি সহজ কৌতুকের প্রস্রবণ তিনি খুলতেন মাঝে মাঝে। কখন কাকে ধরবেন···আমরা বেশ সতর্ক থাকতুম!

১৯৪১-এর কথা বলছি—

তাঁর অবস্থা খুব খারাপ দেখে তাঁকে কলকাতায় আনা হলো ২৫শে জুলাই। কি করে আনা হবে? ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলোয়ের প্রধান কর্ত্তা তখন এন সি ঘোষ···তিনি স্পেশাল সেলুনের ব্যবস্থা করেন এবং সেই সেলুনে করে তাঁকে কলকাতায় আনা হলো। ৩০শে জুলাই বেলা সাড়ে নটায় ডাক্তার ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় করলেন দেহে অস্ত্রোপচার। তিনি বললেন—অবস্থা খুব খারাপ···অস্ত্রোপচারে তবু কতক আশা! অস্ত্রোপচারের পর রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে একটি কবিতা বলতে লাগলেন···অপরে সেটি লিখে নিলেন। এইটিই তাঁর শেষ কবিতা···অন্তিম-শয়নে রচিত। কবিতাটি—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে
হে ছলনাময়ী!
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রহে খালি গোপন রাত্রি।

তোমার জ্যোতিতে তারে

যে পথ দেখায়,

সে যে তার অন্তরের পথ

সে যে চিরস্বচ্ছ।

সহজ বিশ্বাসে সে যে

করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।

৩০ জুলাই, ১৯৪১

সকাল ৯॥ ঘটিকা।

তার পর কদিন···সারা দেশবাসী আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছে —ভগবান···ভগবান! আমরা যাই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে প্রত্যহ···কখনো শুনি, একটু ভালো···কখনো শুনি, খারাপ।

৬ই অগষ্ট কাটলো দারুণ দুশ্চিন্তায়। বৃহস্পতিবার ৭ই অগষ্ট···২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮···বেলা বারোটা কয়েক মিনিটে জগতের রবি, ভারতের কবি গেল অস্তাচলে!

শ্মশান-যাত্রা···অতি হীন অতি দীন ভিখারী থেকে রাজৈশ্বর্য্যশালী পর্য্যন্ত···স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা-বৃদ্ধ···যে-যে পথে কবির মহাপ্রস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল···সব পথে তাঁরা···যেন জনারণ্য! তার পর রাত্রি আটটায় চিতা···এবং রবীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহ সকলের দর্শনাতীত। চিতাভস্ম নেওয়া হলো এবং রৌপ্যপাত্রে সে-ভস্ম নিয়ে পুত্র রথীন্দ্রনাথ পরের দিন সকালে করলেন শান্তিনিকেতন যাত্রা।

সেখানে শ্রাদ্ধ···১৭ই অগষ্ট গিয়েছিলুম কবিতীর্থে··· অন্তরের শ্রদ্ধা অর্ঘ্য দিতে। প্রায় দু-তিন হাজার লোক

উপস্থিত। সে কি বিরাট আয়োজন! সকালে আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরা গান গাইলেন—

ভেঙেছে দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়
তোমারি হোক জয়।

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন আচার্য্য-পদে…শ্রাদ্ধসভায় গান হলো—

তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।

তাঁর শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান-সূচনায় সমবেত কণ্ঠে গান—

সম্মুখে শান্তি-পাবাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধাব।

বেদ উপনিষদ থেকে বাণীপাঠ…তা'র পর শ্রাদ্ধকর্ত্তা রথীন্দ্রনাথের প্রার্থনা। প্রার্থনা-শেষে সেই অমর বাণী—মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ…এবং সর্বশেষে সমবেত কণ্ঠে গান—

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি যাই…
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু,
কোথাও বিচ্ছেদ নাই!
ওঁ শান্তি…ওঁ শান্তি…ওঁ শান্তি!

শেষ

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি-এ কর্তৃক কলিকাতা, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ শিশির পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক উক্ত স্থানে অবস্থিত শিশির প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।